অন্বেষা

নববর্ষ সংকলন

১৪৩২

• সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা •

অন্বেষা

নববর্ষ সংকলন

১৪৩২

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

সম্পাদনা

সুধাংশু শেখর পাল ও অশোক বিশ্বাস

প্রকাশক

এরিকেয়ার

কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংগঠন

সি – ৪৩, নিউ গড়িয়া ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, কলকাতা - ৭০০০৯৪

ওয়েবসাইট: http://aricare.in/index.php

ইমেইল: aricarekolkata@gmail.com; info@aricare.in

দূরাভাষ: +৯১৯৪৩২২০৯৮৫, ৯৮৩০০৪৪১১০, ৯৪৩২০১২৪৬৬

মুদ্রক: মৌসুমী মুখার্জী

সূচিপত্র

কবিতা ৬ - ১১

মুক্তি সাধন বসু, সুধাংশু শেখর পাল, বংশীধর মন্ডল ও লীলাময় পাত্র

গল্প ১২ - ১৫

গৌতম রায়

প্রবন্ধ ১৬ - ২৮

অশোক বিশ্বাস, উৎপলা পার্থসারথি, প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও চৈতালি দত্ত

ভ্রমণ কাহিনী ২৯ - ৫৯

কৃষ্ণ কিশোর শতপথী, সুধাংশু শেখর পাল, মৃন্ময় দত্ত ও রিনা দত্ত, মধুমিতা দাশ ও বিনয় কুমার সাহা

স্মৃতিকথা ৬০ - ৬৩

মধুমিতা দাশ

রম্য রচনা ৬৪

কৃষ্ণেন্দু দাস

সম্পাদকীয়

রহস্যময় বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টির শুরু থেকে দুই বিপরীতধর্মী সত্ত্বা বিদ্যমান। বিজ্ঞানের ভাষায় একটা ধনাত্মক শক্তি আর অপরটা ঋণাত্মক শক্তি, এই দুই সত্ত্বাই মানব জীবনের ধারক ও বাহক। অহরহ দ্বন্দ্বে ব্যস্ত। আর এক আশ্চর্য প্রতিযোগিতা চলছে এই দুইয়ের মধ্যে। এই দুই বিপরীতধর্মী শক্তিপুঞ্জ সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিদ্যমান। কেবল সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক রূপ থেকে আরেক রূপে পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে হয়ে চলেছে আর চলবে অনাদিকাল পর্যন্ত।হাসি- কান্না, জয়- পরাজয়, আনন্দ- নিরানন্দ, সুন্দর ও কুৎসিত, সাদা ও কালো, নতুন ও পুরাতন, আরো কত শত বিপরীত সত্ত্বাগুলির কথা ভাবলে অবাক লাগে। যদি মানব জীবনে বিপরীত ধর্মী শক্তিগুলির অস্তিত্ব, বহিঃপ্রকাশ এবং স্বতঃস্ফুরণ না থাকতো তাহলে মানব জীবন একঘেয়ে আর বোঝা বলে মনে হতো। এই প্রসঙ্গে নুতন আর পুরনো বা প্রবীণের কথা বারবার মনে পড়ে। সদ্যজাতই নুতন বা নবীন। সময়ের অমোঘ নিয়মে নুতনও হবে পুরাতন। নুতনকে পাওয়ার ও ভোগ করার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থেকে জন্ম নেবে শক্তির অন্য রূপের বহিঃপ্রকাশ ।এইভাবে চলবে শক্তির রূপান্তর - সাহিত্যের ভাষায় এক মায়াজাল, এক রহস্য ! এক চরম সত্য ! এক রোমাঞ্চ !

পৃথিবীর সর্বত্রই নববর্ষ একটা ট্রাডিশন বা প্রচলিত সংস্কৃতিধারা। যেকোনো বছরের প্রথম দিন নববর্ষ নামে পরিচিত । পুরাতন বছরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির অন্তিম প্রহর হল অবসান। তিমির রাত্রি ভেদ করে পূর্ব দিগন্তে উদিত হল নতুন দিনের জ্যোতির্ময় সূর্য। প্রকৃতির নিসর্গ মঞ্চে ধ্বনিত হল নবজীবনের সংগীত। আকাশ সাজলো অপরূপ সাজে। গাছে, গাছে আনন্দ উচ্ছ্বাস, পত্রে, পত্রে তার পুলক ও শিহরণ। পাখির কন্ঠে কন্ঠে নবপ্রভাতের বন্দনা গীতি। দিকে দিকে মানুষের বর্ষবরণের উৎসবের আয়োজন। অভিনন্দন আর শঙ্খ ধ্বনিতে হয় নুতন এর অভিষেক, মানুষের হৃদয়ে উৎসারিত কলোচ্ছাসে ভরে গেল পৃথিবী। নূতন দিনের বা বছরের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। ফেলে আসা দিনগুলির অকৃতকার্যতা ও তদজনিত দুঃখ-বেদনা জয়ের প্রেরণা।

পয়লা বৈশাখ বাংলা দিনপঞ্জিকায় বৈশাখ মাসের প্রথম দিন। এই দিনটি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে মহা ধুমধামে পালন করা হয়। এটি বাঙালির একটি সার্বজনীন লোক উৎসব। নববর্ষের দিনটি বছরের অন্য দিন গুলির মধ্যে একটা সাধারণ দিন মাত্র, তথাপি সাধারণ হয়েও অনন্য সাধারণ ও স্বমহিমায় ভাস্বর, আমাদেরই আবেগের ছোঁয়ায়। এ দিনটি আমাদের কাছে মুক্তির বার্তাবাহক- মুক্তি গতানুগতিক জীবন যাপন থেকে; মুক্তি চিত্তের হতাশা ও দৈনতা থেকে। পেতে চাই মহাজীবনের উদার সান্নিধ্য। বর্ষারম্ভের পূণ্য মুহুর্তে নবোদিত সূর্যালোকের ঝর্ণাধারায় শুচিস্নাত হয়ে আমরা কি পারবো পরম প্রেমময়ের আনন্দ স্পর্শ অনুভব করতে? বারে বারে জাগে সংশয়, যেন আভাস পাই কিসের অশনি সংকেত !

বিশ্বায়নের দৌলতে গ্রাম বাংলা কিংবা শহরে বাংলা নববর্ষ পালনের রীতিনীতি ক্রমাগত বদলাচ্ছে। আর এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠানগুলি প্রাথমিক ও একান্ত আনুষঙ্গিক সেগুলি এখনো বিদ্যমান। যেমন সকালে নিত্যকর্ম সমাধান করে নূতন বস্ত্র পরিধান করে প্রভাত ফেরীতে যোগদান, নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়, বিশেষ প্রকার ব্যঞ্জনাদির প্রস্তুতি ও সপরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে খাওয়াদাওয়া। সন্ধ্যায় কোথাও ঘুরে আসা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কোন মেলায় যোগদান ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত বিত্তবানেরা চলে যান শহর থেকে দূর কোন শহরে বা অন্যত্র নববর্ষ পালন করতে।

মনে ইচ্ছা থাকলে তো আর যথাযথভাবে উৎসব পালন করা যায় না, চাই সুস্থ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। আর এই সমস্ত ব্যাপারে চিন্তা করলে কখনো কখনো মন হতাশায় বিদ্ধ হয়। বারবার মনে আসে একটা অতি পরিচিত বাগধারা- "অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত"! বললে অত্যুক্তি হবে না, আমরা কি ধীরে ধীরে অন্ধত্ব ও ক্লিবতার শিকার হতে চলেছি আর এই পরিস্থিতিতে নববর্ষ বা কোন উৎসব পালন কতটা উপভোগ্য হবে? তবে এটা নিশ্চিত সমাজের একটা অংশের কাছে বছরের সব সময়টাই পৌষ মাস আর বাকিদের কাছে সর্বনাশ ।এখানে বাকি অর্থে আমজনতা। কতিপয়

লোভী, স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী পিশাচদের পদতলে পিষ্ঠ ও নিগৃহীত। আমরা কি আমাদের ক্লীবত্ব, অন্ধত্ব পরিহার করে ও সমস্ত দুরাচারীদের বিনাশ করে এক সুস্থির সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি ? আর এটাই হবে নববর্ষ পালনের উদ্দেশ্য।

বিগত কয়েক বছর ধরে 'অন্বেষা'র বৈদ্যুতিন সংস্করণ প্রকাশ জারি আছে। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের নিরলস প্রয়াসে এই পত্রিকার প্রকাশন ও গুণবত্তা সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং বৃহত্তর পরিসরে এই পত্রিকার প্রচার ও প্রসারে আমরা ব্রতী হচ্ছি। যে সমস্ত লেখক লেখিকারা তাঁদের জ্ঞানগর্ভ অভিজ্ঞতা চিন্তা ও মননের মাধ্যমে বিভিন্ন লেখন প্রস্তুত করেছেন তাঁদের জানাই অজস্র সাধুবাদ, প্রশংসা ও অভিনন্দন। আশাকরি ভবিষ্যতে আমরা তাঁদের ও অন্য সদস্যদের থেকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেয়ে 'অন্বেষা'র মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার উদ্যোগ ও গুণবত্তা বৃহত্তর সুধী পাঠকমন্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করতে ব্রতী হব। সবাইকে জানাই বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। *"সর্বে ভবন্তু সুখিন,সর্বে সন্তু নিরাময়া"*

সম্পাদকমন্ডলী

মধ্যবিত্তর রোজনামচা

মুক্তি সাধন বসু

চলতে চলতে মাঠের মাঝে পথ,
ঘামতে ঘামতে এক পুকুর জল,
কাঁদতে কাঁদতে একটা কাঁসাই নদী;
ভাবতে ভাবতে মাথার উপর মেঘ,
দেখতে দেখতে আকাশ বেয়ে বৃষ্টি,
পায়ে পায়ে রুক্ষপথে নরম মাটির সুখ !

স্বপ্ন যত ছেঁড়া কাঁথায় মোড়া,
পুঁটলি বাঁধা ঘরের কোনে পড়ে,
পালাক্রমে পুড়ছে রোদে,ভিজছে জলে;
ভাঁঙা চালে আকাশ তলে মরুস্থলে,
শুকনো ঘাসে রিক্ত রাতের ছবি,
সবুজ গুলো কেবল দূরে যায় সরে !

প্রভুর রূপে তুমি এলে সাধুর বেশে,
দানে দিলে রুপোর কাঠি রিক্ত হাতে,
ক্ষনিক সুখে ভাসছি সবাই চোরাস্রোতে;
ভেলায় ভেসে বাঁচার আশায় লক্ষ লখিন্দর।
জাগবে আবার অনুদানের চন্ডীপাঠে,
বাঁচা মরা তোমার হাতে, সত্য চিরন্তন !

দেবতা আমার এসো এবার স্বর্ণ রথে,
শেষ জীবনের গোধূলিতে রং মিলিয়ে,
চিত্ত ভরুক দীপ্ত সুখে সোনার ধুলায়,
মৃত মুখ উঠুক জেগে আশায় ভাষায়,
অহংকারের অলংকারে নিত্য সাজাও,
যোগ্য তুমি,এদেশ তোমার ভোগ বিলাসের !

নুতন নিয়ে খেলা

সুধাংশু শেখর পাল

নুতন নিয়ে খেলা;
ভোর হয়ে এলো বেলা,
এখনই উঠিবে সূর্য, নব দিনকর
গিরিকন্দর, মরুদেশ,
উদ্ভাসিত চতুর্দিক স্বর্ণালী আলোকে;
অধীর আগ্রহের অবসান।

হে নুতন, তোমারে করি আবাহন
পরম আবেশে।
নুতন নিয়ে খেলা,
নুতন বেশ, নুতন দেশ,
নুতন গৃহস্ত্রী; কিংবা নুতন পরিস্থিতি
কোথাও লুকিয়ে যেন এক রোমাঞ্চ,
পাই এক শিহরণ;
কাছে পাবার অনির্বাণ আকর্ষণ!
দুর্নিবার মোহ, কিম্বা অপার মুঢ়তা?
নুতন নিয়ে খেলা, আড়চোখে চাহে পুরাতন
এসো বরণ করি ক্ষণিকের অতিথি,
কালস্রোতে ভেসে যাবে,
তুমিও হইবে প্রবীণ।।

নুতন নিয়ে খেলা,
কবে শুরু, কবে শেষ ?
না আছে লেখা, না হবে অন্ত;
মোহ মায়া ভরা এ সংসারে
শুধু খেলা, শুধু খেলা;
দেখি সর্বত্র নুতনের মেলা।

এখনই ডুবিবে সূর্য, অস্তাচল গামী
কাল সমুদ্রের অতল গর্ভে
তুমিও হইবে বিসর্জিত, হে নুতন,
হে ক্ষণিকের অতিথি, হে সনাতন।।

****

নিশি অবসান ওই পুরাতন
বর্ষ হলো গত ,
আমি আজ ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত।
বন্ধু হও, শত্রু হও যেখানে যে কেউ রও,
ক্ষমা করো আজিকার মতো,
পুরাতন বর্ষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যতো।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-

লাগাতার কড়া নেড়ে যাই

বংশীধর মন্ডল

ভাবনার ভাড়ারের দরজা বন্ধ,
অন্তরে ভাঙচুরের অনবরত কোলাহল,
নিরপেক্ষ সততা নীরবতায় স্থির,
ঘুরে, ঘুরে মন খোঁজে পালাবার দ্বার ।
নুতন সূর্যের খোঁজে, কাল যায় কালান্তরে-
নুতন রোদ্দুরের খোঁজে, যুগ যায় যুগান্তরে-
অনুরাগের স্বর্গ খোঁজে অবাক জানালা।
অভিলাশে অভিভূত নিরাশার চোখ,
বিশুদ্ধ চেতন, আকাশ জুড়ে সন্ত্রাস
তখনো মেঘে মেঘে নিকষ কালো অন্ধকার,
অনিত্যের পিছনে নিত্যের উপলব্ধি-
আমি লাগাতার কড়া নেড়ে যাই;
একান্তে আচ্ছন্ন তন্দ্রা, মর্মাহত বিবেক।।

ইতঃস্তত সংশয়

বংশীধর মন্ডল

স্বপ্ন দেখার লোভে উত্তর কাল শেষ,
সংসারের ইতঃস্তত আকুতি
স্বপ্ন দেখার বয়সে আমি পুরুষ পুঙ্গব।
আগেও স্বপ্ন দেখেছি বিস্তর;
সে তো গতানুগতিক অলীক কল্পনার,
আবেগ মথিত পূর্ণতার জন্যই স্বপ্ন।
নুতন কিছু তো চাইতেই হয়।
আমি তো সন্ন্যাসী নই,
প্রেমের ভাষণ দিয়েছি সেই কবে,
ঢাউস এক আয়নার সামনে দাঁড়াতেই
ওপারে এক ব্যক্তি বিকৃত মুখ,
জ্ঞানবৃক্ষ, বড় বড় চোখ, নীলাভ রঙ
এখন নয় হৃদয়ে ক্ষতের অনুভূতি।
একান্তে গুমরে গুমরে মরে তার গম্ভীর ভাব।
নোনাজলে গা ভেজাচ্ছে,
চেয়ে দেখা যায় না দৃশ্য এমন।
ভয়ে ভয়ে চোখ বুঁজতে উধাও সে ।।

আপনজন

লীলাময় পাত্র

সূর্যটা রোজ দেখতে আসে তোকে
জানিস কি রে মন,
জানলা খুলে দেখ
ছুটে আসা ফাগুন হাওয়া
যেন আপনজন ।

সেই হাওয়াটাই জড়িয়ে ধরতে চায়
হঠাৎ যদি বন্ধুর দেখা পায়,
হৃদয় জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে
ফিরে পাওয়া
স্মৃতির শিহরণ ।

হয়তো দিনলিপির কোন এক পাতায়
সময় যেন কাছে এসে দাঁড়ায়,
চেনা সুর বাজিয়ে দিয়ে
ছুঁয়ে যায়
একান্ত যে আপন ॥

গল্প

আর কিছু নেই প্রয়োজন

গৌতম রায়

পরপর তিন রাত জেগে কাজ করছে শ্রেয়ান। নতুন এই চাকরিটা পাবার পর থেকেই ওর কাজ যেন বহুগুণ বেড়ে গেছে! এই হয়েছে এই আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরির বিপদ। একই কোম্পানিতে যদি বছরের পর বছর কেউ থেকে যায়, তার অনেকটা নিশ্চিন্ত জীবন হয়ে যায়, এটা ঠিক। কিন্তু মুশকিল হল প্রতি বছরে সরকারি চাকরিতে যেমন নিয়ম করে মাইনে কিছুটা হলেও বাড়ে, এই ধরনের প্রাইভেট কোম্পানির, বিশেষ করে এই ধরনের আইটি কোম্পানিতে সেরকম একেবারেই হয় না। বছরের পর বছর হয়তো কোনো টাকা-পয়সা বাড়ালোই না। আর বাড়ালেও তা অত্যন্ত কম। কিন্তু সেই কোম্পানি আবার একই ধরনের কাজের জন্য অন্য কোম্পানি থেকে কাজের লোক অনেক বেশি টাকার অফার দিয়ে নিয়ে আসে। তাই এই ধরনের চাকরিতে মাঝেমাঝেই কোম্পানি পাল্টাতে হয়। না হলে সেই লোকের আর কোন দাম থাকেনা সেই কোম্পানির কাছে।

শ্রেয়ান আগের এরকমই এক কোম্পানিতে প্রায় পাঁচ বছর কাজ করেছে। পুরো একটা টিমের ইনচার্জ ছিল ও। কিন্তু ওর জুনিয়রদের মাইনে বাড়লেও ওর মাইনে প্রায় কিছুই বাড়ছিল না। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই ও এই নতুন চাকরিতে আগের মাসে জয়েন করেছে। এখানে মাইনে আগের থেকে প্রায় তিনগুন যেমন বেশী পাচ্ছে ও, তেমনি কাজের দায়িত্ব এখানে অত্যধিক রকমের বেশি। এই কোম্পানির কাস্টমার সাপোর্টটা পুরোপুরি ওকেই দেখতে হয়। বেশিরভাগ ক্লায়েন্টই হয় আমেরিকার আর নয়তো ফ্রান্সের তাই সেই দেশের কাজের সময় অনুযায়ী শ্রেয়ান কে সারা রাত জেগে কাজ করতে হয়। কিন্তু সেইসব ক্লায়েন্টদের কাজের বেশিরভাগ অংশ প্রায়ই সেই রাতের মধ্যে শেষ হয়না। তাই পরের রাত আসার আগে সারাদিনের সময়ের মধ্যে ওকে সেই কাস্টমারের সাপোর্টের সবটুকু কাজ শেষ করতেই হয়। ফলে দিনের চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রায় কুড়ি – বাইশ ঘন্টা ওকে কাজ নিয়েই থাকতে হয়। ঘুম হয় না একদম। ঘুমের সেরকম সময়, সুযোগ কিছুই পায়না ও। তিন-চার ঘণ্টা ঘুমের সময় পেলে ও সেই কাজের টেনশনে ঘুম প্রায় আসেই না।

শ্রেয়ান এর আদি বাড়ি চন্দননগরে, বাগবাজারের কাছে। ওখানে ওর স্ত্রী দীপ্তি একাই থাকে। ওদের মাত্র তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে। আগে শ্রেয়ান চন্দননগরেই থাকতো স্ত্রীর সাথে। আগের কোম্পানিতে তখন পুরোটাই ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে হতো। ফলে এক সাথে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেবার কোন অসুবিধে ছিল না ওদের। কিন্তু এই নতুন চাকরি পাওয়ার পর থেকেই ওকে নিউটাউনে একটা ছোট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে থাকতে হচ্ছে। ওর অফিসের খুব কাছেই সেই ফ্লাট।

দীপ্তি চন্দননগরের এক প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। সকালে স্কুল! তাই দুজনেরই চাকরি বাঁচাতে দুজনকে দু'জায়গায় থাকতে হয়। ইচ্ছে থাকলেও একসাথে থাকা হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে শ্রেয়ান কাজের মধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ভাবতে থাকে এর নামই কি জীবন? একেই কি বলে বেঁচে থাকা? এই জীবনের জন্যেই কি ওকে অমানুষিক পরিশ্রম করে চলতে হচ্ছে এভাবে? মাঝে মাঝে ও এটাও ভাবে যে, চাকরির জন্য জীবন? নাকি জীবনের জন্য চাকরি?

দীপ্তি সন্তানসম্ভবা। আর দুমাস পরেই ওর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার তারিখ দিয়েছে ডাক্তার। অন্য আর কোনো কিছু উপায় নেই বলে- সংসারের সমস্ত কাজ এবং ডাক্তারের কথামত সবকিছু চিকিৎসার দায়িত্ব নিজেকেই সামলাতে হয় দীপ্তিকে। ও বোঝে - সংসারে আর একটু বেশি স্বাচ্ছন্দের জন্য শ্রেয়ানকে দূরে থেকে উদয় অস্ত খেটে যেতে হচ্ছে। তাই ওর নিজের দেখাশোনার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হয়েছে।

শ্রেয়ান এর মাঝে মাঝে নিজেকে বেশ অসহায় বোধ করে এই নতুন কোম্পানিতে। চাকরির সুবাদে ওর অনেক টাকাই এখন উপায় হচ্ছে এটা সত্যি, কিন্তু তার বদলে প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই ওকে যেন কেউ একটা অদৃশ্য শেকলে বেঁধে রেখেছে মনে হয় ওর। শ্রেয়ান বোঝে, এই বিদেশী ক্লায়েন্ট গুলো যদি একবার কোনো ব্যাপারে ঠিকমতো দরকারি কাজটা পায়, তাহলে তারা এই কোম্পানি ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনো একইরকম কোম্পানির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলবে। ফলে ওর কোম্পানি এই বিশাল বিদেশি মুদ্রার আয় থেকে বঞ্চিত হবে।

তারপর অবধারিতভাবেই শ্রেয়ান এর উপর আসবে তার ঝড়টা। আর তার ফলশ্রুতিতে হিসেবে প্রথমে ওর চাকরিটা যাবে। তাছাড়া ওই ধরনের যে কোম্পানি গুলো আছে তাদের কাছেও ওর নাম একবারে ব্লাকলিস্টে তুলে দেবে। ফলে ভবিষ্যতে এই ধরনের চাকরি পাওয়াটাই একটা বিরাট সমস্যার মধ্যে চলে আসবে। এই সবকিছু থেকে বাঁচতে তাই শ্রেয়ান একেবারে সব সময় অফিসের কাজে একদম রেডি হয়ে থাকে। থাকতেই হয়৷ নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্য ভাববার সময় তাই একেবারেই পায় না৷ সব সময় কোম্পানির কাজের জন্য যেন জীবনটাই উৎসর্গ করে রেখেছে ও।

আজ রাতে একটা ঘটনা ঘটলো। রাত তখন খুব বেশি হয়নি৷ রাত দশটা, সাড়ে-দশটা বাজে। শ্রেয়ান তখন সবেমাত্র সেদিনের প্রথম ক্লায়েন্টকে সাপোর্‌ট দিচ্ছিল বাড়ি বসে। এই ক্লায়েন্ট খুবই বড় এক পার্টি যারা কয়েক বিলিয়ন ডলারের কাজ করে শ্রেয়ানের কোম্পানির সাথে। কিন্তু এরা আবার তেমনই বদমেজাজি এক কোম্পানি। কোন প্রবলেম হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই যদি তার ঠিকমত সাপোর্ট ওরা না পায় তাহলে ভীষণ খারাপ রিপোর্ট দেয় সেই কর্মচারীর ওয়ার্ক ফাইলে৷। এমনকি সেই সাপোর্টিং কোম্পানির সাথে সেই বিলিয়ন ডলারের অর্ডার বাতিল করতেও বিন্দুমাত্র এরা দ্বিধা করে না । এরকম সুনাম বা দুর্নাম এই কোম্পানির ভালোই আছে। তাই কল পেলে একটু বেশি সতর্ক হয়ে থাকতে হয় শ্রেয়ানকে। আজ সেরকমই কোনো একটা দিন৷

রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। শ্রেয়ানের মোবাইলে বারবার একটা ফোন আসছে। বেশ বিরক্ত লাগছে। এত জটিল একটা প্রবলেম দেখতে হচ্ছে এখন। এদিকে বেশ কিছুক্ষণ সময়ও চলে গেছে, এখনো প্রবলেমটা সলভ করা যায়নি। এই সময় ওই অচেনা নাম্বার থেকে কি একটা বারবার ফোন আসছে। একবার এখন ফোনটা নিলে পুরো মনটা অন্যদিকে চলে যাবে আর তাহলে এই প্রবলেমটা সলভ করা আরো শক্ত হয়ে যাবে । একবার মনটা অন্যদিকে চলে গেলে আবার মনটাকে ঠিক ওইখানে আনতে বেশ সমস্যা হবে। তাই শ্রেয়ান ফোনটা না ধরারই চেষ্টা করছিল। কিন্তু বারবার সেই একই নম্বর থেকে ফোন আসায় বারবার মন:সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল ওর। কিন্তু ফোনটা একবার না নিলে বোধ হয় সারা রাত এরকম চলতেই থাকবে। তাই খুব অনিচ্ছাসত্বেও কাজটা ছেড়ে ফোনটা রিসিভ করলো শ্রেয়ান।

- হ্যালো কে বলছেন?

- আচ্ছা মানুষ তো তুমি! এতবার ফোন করছি একবার ফোনটা ধরতে কিসের কষ্ট হয় তোমার? তুমি কি মনে করো এই রাতে তোমায় ফোন করে রসালাপ করব?

আরো কীসব বলতে যাচ্ছিল সেই অপরিচিত কন্ঠ ফোনের লাইনের অন্যদিক থেকে, কিন্তু শ্রেয়ান

ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে-

-কি সব বলছেন আপনি? কে আপনি? আমায় কেনই বা ফোন করছেন আপনি?

-আমি তোমার চন্দননগরের বাড়ির পাশেই থাকি। তুমি, দীপ্তি আমায় কাকাবাবু ডাকো। শোনো, দীপ্তি কিছু সময় আগে বাথরুম থেকে বেরোতে গিয়ে খুব জোরে পড়ে গেছে। ওর গোঙানির আওয়াজ শুনে আমার ছেলে বাড়ির পাঁচিল টপকে গিয়ে তোমার বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে। দেখি তোমার বউ বাথরুমের বাইরে পড়ে গিয়ে গোঙাচ্ছে আর চারদিকে একেবারে রক্তারক্তি কান্ড। আমরা ওকে ধরাধরি করে পাশে ড: সোমের নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়েছি। অবস্থা ভালো না। বউকে বাঁচাতে চাইলে এক্ষুনি চলে এসো। রাখছি।

সমস্ত পৃথিবীটা যেন হঠাৎ চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর মনে হলো সেই চাপ চাপ অন্ধকার থেকে দীপ্তি হাত বাড়িয়ে বলছে - আমায় বাঁচাও শ্রেয়ান। তোমার সন্তানকে বাঁচাও। অন্তত একদিন তোমার কাজ থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচাও আমাদের।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শ্রেয়ান নিজের চেতনা ফিরে পেলো। এক ঝটকায় আগে ল্যাপটপের সুইচটা বন্ধ করে দিল যাতে পৃথিবীর আর অন্য কেউই যেন এখন ওকে বিরক্ত না করতে পারে। তারপর টাকাপয়সা যেটুকু ছিল— নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একটু আগেই সেই মার্কিন কোম্পানির যে লোকটি বেশ ধমকের সুরে কথা বলছিলো ওর সাথে - তার কথা এখন ও স্রেফ ভুলে গেল। এখন ও স্বাধীন। ওর জীবনে এই মুহূর্তে এখন সবচেয়ে বড়ো প্রায়োরিটি ওর প্রিয়তমা স্ত্রী দীপ্তির জীবন এবং তার অনাগত সন্তানের জীবন বাঁচানো।

ড: সোম শ্রেয়ানের অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন। শ্রেয়ান ঢুকতেই বললেন — শোনো ওর খুব সিরিয়াস অবস্থা। পড়ে গিয়ে পেটে এমন লেগেছে যে সন্তানের সাথে মায়ের যে নাড়ির যোগাযোগ থাকে প্লাসেন্টা দিয়ে, সেটা ছিঁড়ে গেছে। এটাকে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া বলে। এই অবস্থায় পেটের ভেতর বেবি নিশ্বাস বন্ধ অবস্থায় চলে যায়। এখুনি না ফোর্সড সিজার করা গেলে - বেবি তো যাবেই, মায়ের অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে যেতে পারে!

- ডাক্তারবাবু তাহলে এখুনি অপারেট করে দিন না প্লিজ !

- সে তো করবো। করতেই হবে। কিন্তু এত রাতে আমি এনেসথেসিস্ট কাকে পাব? দু'জনকে ফোন করলাম, তারা আসতে পারবে না বলেছে। কি করব সেটাই ভাবছি। পেশেন্টের যা অবস্থা তাতে এখন ওকে অন্য কোনো জায়গায়, কোনো বড়ো হাসপাতালে শিফট করাও যাবেনা।

- ডাক্তার বাবু, আপনি ওই ডাক্তারের ঠিকানাটা দিন, আমি যেভাবে হোক অনুরোধ করে ওনাকে ঠিক নিয়ে আসব। সবচেয়ে কাছে কে থাকেন?

- না না এভাবে হবে না। একটা কাজ করো। আমার সাথে চলো। কাছে গিয়ে না হয় ভালো করে অনুরোধ করে দেখি৷ দুজনে মিলে বললে একটা পসিটিভ কিছু হতে হতে পারে। দাঁড়াও। আমি গাড়ি বার করছি। ড: হাজরা সবচেয়ে কাছে থাকে । ওর বাড়ি গিয়ে দুজনে মিলে বলে দেখি যদি কিছু করা যায়! একবার যদি আসে।

অবশেষে তাই হল। ড: সোম নিজেই গাড়ি চালিয়ে গেলেন ড: হাজরার বাড়ি। রাতে ঘুম থেকে তুলে তাঁকে অনেক করে অনুরোধ করলেন ড: সোম আর শ্রেয়ান। শেষে ডক্টর হাজরা বললেন চলুন, একটা Noble cause এর জন্য আজকে ঘুমটা না হয় বাদই দিলাম।

বিপদের আরো কিছুটা বাকি ছিল তখনো। যখন OT তে দীপ্তিকে কে নিয়ে গিয়ে রেডি করার পর ডাক্তার দুজন সবেমাত্র ঢুকতে যাচ্ছেন ভেতরে, একটা বিরাট আওয়াজ করে পাওয়ার অফ হয়ে গেল। ডঃ সোম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, যেভাবে পাওয়ার অফ হলো এরকম জোরে আওয়াজ করে, মনে হয় কেবল ফল্ট হলো। তাহলে তো পাওয়ার দু-তিন দিনের আগে আসবে বলে মনে হয় না। আমার নার্সিংহোমে তো কোনো জেনারেটর নেই।

আর্ত চিৎকার করে উঠল শ্রেয়ান।

-না ডাক্তার বাবু প্লিজ হাল ছাড়বেন না। এখনই অপারেশন করতে হবে। দীপ্তি কে আর বেবিকে বাঁচাতেই হবে ডাক্তার বাবু৷ আপনি প্লিজ কিছু করুন!

- আরে আমি আর কি করবো এখন? আমি কি এই অন্ধকারে মোমবাতির আলোয় অপারেশন করবো? ঠিকমতো আলো ছাড়া কি হয় এসব? আলো ছাড়াও ইলেকট্রিসিটি না থাকলে এত ইনস্ট্রুমেন্ট, ইকুইপমেন্ট চলবে কি ভাবে? তাছাড়া ওরকম একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে, এরকম ভাবে আর কি করতে পারি আমি? যা যা করা যায় - সব কিছুরই চেষ্টা তো করলাম আমি। আর কি করতে পারি – তুমি বলো? আর তো কিছু করার নেই আমাদের।

- ঠিক আছে ডাক্তার বাবু ! আমায় একটু সময় দিন প্লিজ! দেখি — যে করেই হোক একটু আলোর ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে এখুনি। একটু প্লিজ অপেক্ষা করুন আপনারা। চলে যাবেন না প্লিজ!

বিদ্যুৎ গতিতে তখন শ্রেয়ানের মনে পড়ে গেল পরেশের কথা।পরেশের জেনারেটর ভাড়া দেওয়ার দোকান আছে। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝরাতে শ্রেয়ান ছুটলো পাড়ায় পরেশের বাড়ি। ছুটে ছুটে পরেশের বাড়ি গিয়ে দরজা ধাক্কাতে লাগল শ্রেয়ান। তারপর পরেশ কে সাথে নিয়ে ছুটলো তার দোকানে। জেনারেটর নিয়ে নিজের ভ্যান গাড়ি চালিয়ে সেটা নিয়ে গেল ড: পরেশ সোমের নার্সিংহোমে। তারপর সেই জেনারেটর কানেকশন করে OT সমেত নার্সিংহোমে জ্বালানো হলো হলো আলো। এরপর কিছু নিঃশব্দ প্রহর গেল। এক একটা সেকেন্ড যেন একেকটা ঘন্টার চেয়েও বড় হয়ে উঠে শ্রেয়ান কে গিলে খেতে লাগল। সময় যেন আর কাটতেই চাইছিল না।

অবশেষে সেই মুহূর্ত এলো। ভেতর থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল। উত্তেজনায় সবার যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল এতোক্ষন । অবশেষে ড: সোম একটু পরে বাইরে বেরিয়ে জানালেন - মেয়ে হয়েছে। তবে এতো আগে জন্ম নিল বলে ওর ওজন খুব কম হয়েছে। মাত্র এক কিলোগ্রাম আটশো গ্রাম ।তা ছাড়া বেবির নিঃশ্বাসেরও ও বেশ বড়ো ধরনের সমস্যা আছে। কোন বড়ো হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ইনকিউবেটরে রাখতে হবে এখনই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

- দীপ্তি কেমন আছে ডাক্তার বাবু?

-হ্যাঁ। ও ভালো আছে। তবে এখন এনেস্থিসিয়ার মধ্যে আছে। খুব বড়ো অপারেশন হলো তো!

সিস্টার এই সময় একবার বেবিকে বাইরে নিয়ে এসে দেখালেন। সেই সদ্যোজাত মেয়ে তখন বোধহয় চোখ পিটপিট করে তার বাবাকেই দেখার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ শ্রেয়ানের নিজেকে ভীষণ হালকা লাগতে লাগলো। মনে মনে ওর ওই চাকরির মুখে লাথি মেরে অনেক কিছু প্রতিজ্ঞা করে ফেলল। দীপ্তি কে মনে মনে বলতে লাগলো - আমায় ক্ষমা করো দীপ্তি। আর কখনো আমি শুধু টাকার পেছনে ছুটে তোমাকে, আমার মেয়েকে আর অবহেলা করবো না। তোমরা ভালো না থাকলে আমার এই এত পরিশ্রমের টাকা পয়সা দিয়ে কি হবে বলো? আমি এবার দেখো - এখানেই কোনো একটা ছোটখাটো কাজ দেখে নেবো আর তোমাদের দুজনকে নিয়ে শান্তিতে থাকবো ভালোবাসায় বুঁদ হয়ে থাকবো সব সময়৷ আমাদের বেশি টাকা পয়সার আর দরকার নেই। আমরা এবার থেকে ভালো থাকবো। শান্তিতে থাকবো। তোমাকে আরেকটু ভালোভাবে রাখবো বলে - তোমাকেই তো হারিয়ে ফেলছিলাম আমি ! আমায় ক্ষমা করে দাও দীপ্তি। আমি তোমাদের ছেড়ে আর কোথাও যাবো না কোনোদিন৷

তখন সবে মাত্র সমস্ত ক্লান্তি আর ক্লেদ ছেড়ে একটা নতুন স্বপ্নের সূর্য উঠছে পুবের আকাশে। সব কিছুই এখন সুন্দর আর নতুন করে ভালো লাগছে শ্রেয়ানের। বড়ো বড়ো পা ফেলে এখন ও চলেছে এই নতুন দিনের সকালে নিজের বাড়িতে নতুন শান্তির খোঁজে৷ হঠাৎ সেই ছোটবেলার মতো শীষ দিয়ে একটা খুব প্রিয় গান গেয়ে উঠলো শ্রেয়ান৷ সেই নতুন সুগন্ধি ভোরে আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো সুর *.." তোমাকে পেয়েছি, আর কিছু নেই প্রয়োজন…"!!*

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের ভক্তিবাদ ও তৎকালীন বাংলা

অশোক বিশ্বাস

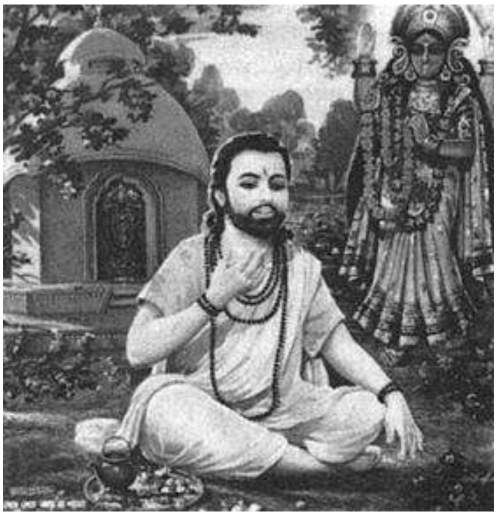

ভূমিকা

পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাংলায় যে ভক্তি আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার সুযোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন। চৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৬ – ১৫৩৩) ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ঐশ্বরিক প্রেমের উপর জোর দিয়েছিলেন । পরবর্তী সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব বিপ্লবের উত্তরণ ঘটিয়েছেন রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদ সেন ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ কালীসাধক, যে কারণে তাঁর সংগীত ও কাব্য প্রতিভা দেবী কালীর চরণে অর্পণ করেছিলেন। রামপ্রসাদ শাক্তধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার করেন শাক্তগীতি রচনা করে। রামপ্রসাদের চেষ্টা ছিল শক্তি সাধনাকে নীরস শাস্ত্রাচার ও তান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করে একটি সহজ আবেদন পূর্ণ সাংগীতিক অভিব্যক্তি দান করা।

রামপ্রসাদ সেনের ভক্তিবাদ

শাক্ত কবিদের মধ্যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সর্বাধিক জনপ্রিয়। শাক্ত পদাবলির প্রথম প্রবর্তকও তিনি। রামপ্রসাদের জীবনীকার কবি ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদ সেনকেই শাক্ত সংগীতের পথিকৃৎ সাধক বলেছেন। এই বিষয়ে গবেষক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "সারা দেশে রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার একটা কারণ বাস্তব দুঃখকে তিনি বৈষ্ণব পদাবলির মতো সূক্ষ্ম রসে পরিণত করেন নাই; তাহাকে স্বীকার করিয়া তাহা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছেন। দুঃখবেদনা হইতে পলায়ন নহে, তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াও নহে— আদ্যাশক্তির কৃপায় কবি সমস্ত সুখ-দুঃখ ত্যাগ করিয়া মুক্তির পথ খুঁজিয়াছেন।

কবি দুঃখের আঘাতে আরও নিবিড় করিয়া জননীকে চিনিয়া লইয়াছেন। কবি দেখিয়াছেন, দুঃখ হইতে পরিত্রাণের পথ শ্যামার চরণে আশ্রয় গ্রহণ। তদানীন্তন কুশাসন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নিত্য দারিদ্র্য— ইহা হইতে মুক্তির পথ কোথায়? সেই পথই রামপ্রসাদ দেখাইয়াছেন"।

ভক্তের আকুতি এবং জগজ্জননীর রূপ অর্থাৎ 'উপাস্য-উপাসনা' তত্ত্বের পদ রচনার পদপ্রদর্শক ছিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ। কালী মায়ের সাধনায় তিনি ছিলেন আত্মসমাহিত। তার গানের মধ্যে আমরা জাগতিক দুঃখবেদনার কথা শুনতে পাই। বাস্তব জীবনের দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হতে সাধনার মাধ্যমে উত্তরণের পথ দেখিয়ে ছিলেন সাধক রামপ্রসাদ। তাই বাঙালি রামপ্রসাদের পদাবলি আজও মনের গভীরে ধারণ করে। রামপ্রসাদ সেনের অসংখ্য কালীকীর্তনে অন্তর্নিহিত রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ দার্শনিক চিন্তন। পরবর্তীকালে সাধক কমলাকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, লালন ফকির, ও রজনীকান্তের গানেও রামপ্রসাদী কীর্তন ও শ্যামাসংগীতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সহজ সরল সুর ও সহজবোধ্য বাণীর জন্য আজও রামপ্রসাদী সংগীত মানুষের মুখে মুখে বেঁচে আছে।

রামপ্রসাদের অন্যতম জনপ্রিয় গান "মন রে কৃষিকাজ জান না / এমন মানব জনম রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা" মূলত আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত। গানটিতে একটি অনুযোগ বা অনুশোচনার সুর রয়েছে, যেখানে রামপ্রসাদ মনে করেন যে তিনি জীবনের আসল কাজ বা শিক্ষা অর্জন করতে পারেননি।এখানে "কৃষিকাজ" শব্দটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে জীবনের আসল কাজ, যেমন - ঈশ্বর বা প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন, বা জীবনের গভীর অর্থ উপলব্ধি করা। গানটি মানুষকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে এবং আধ্যাত্মিক পথে চলতে উৎসাহিত করে।

রামপ্রসাদ সেনের সময়কাল ও তৎকালীন বাংলার সমাজ

রামপ্রসাদ সেনের সময়কাল (১৭২০ থেকে ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) অষ্টাদশ শতাব্দী। এই শতকে বাংলার আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। এই সময় দেশি বিদেশি সুযোগসন্ধানী বণিকেরা বাণিজ্য করতে এসে বাংলায় বসতি গড়েছিল ও বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষমতা হাতের মুঠোয় পুরে নিয়েছিল। শতাব্দীর শেষদিকে রাজস্থানের মাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী যোধপুরের বণিকগোষ্ঠী 'জগৎশেঠরা বাংলায় টাকশাল পরিচালনা, মুদ্রা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। বেনারসের বণিক গোষ্ঠী গোপালদাস-মনোহরদাস-দ্বারকাদাস, পাঞ্জাবি হুজুরিমল, আর্মেনীয় খাজা ওয়াজেদদের মতো বণিকরা এবং 'জগৎশেঠ'রা ইউরোপীয় ও দেশীয় বণিকদের ব্যবসার মূলধন যোগান দিত। বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলের জমিদারি দখল করে শাসক হয়ে বসে অবাঙালি গোষ্ঠী।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি ঘোর অরাজকতার সময়ে যখন ক্লাইভ, হেস্টিংস এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা বিপুল টাকা কার্যত লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে ইংল্যান্ডে, তখন তাদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক ছিলেন উচ্চ পদাধিকারী দেশীয় রাজন্য বর্গ। এরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তাঁবেদারি করে আখের গুছিয়ে হয়ে উঠেছিলেন সমাজের কেষ্টবিষ্টু। তাদের বৈভবের আস্ফালন প্রকাশ পেতো বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে ও উৎসবে। এক নির্লজ্জ দেখনদারীর প্রতিযোগিতা ছিল, যা সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিতো। অত্যন্ত ধনী রাজা মহারাজারা ছাড়া সমাজে উচ্চ স্থানে ছিলেন মূলত উচ্চবর্ণের আরবি- ফারসি- ইংরেজি জানা বিত্তশালী জীবন যাপনে আগ্রহী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী। তারা দেশীয় রাজা মহারাজাদের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন। অন্য শ্রেণীটি ছিল নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। যারা পদে পদে আর্থ সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসনকাল ১৭৫৭ সালে শেষ হয়। ইংরেজ বেনিয়া ও অর্থলোভী শাসক ও ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রের জালে বাংলায় ইংরেজ শাসন কায়েম হয়। এক কথায় বাংলায় এক অস্থির সংকটময় সময়। লক্ষ লক্ষ তাঁত শ্রমিক সেই সময় ভিনদেশি বণিকদের হাতে খেলার পুতুলে পরিণত হয় ও তাদের জীবন চরম অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য ও রামপ্রসাদী গান কোনো ধর্মের কথা বলেনি, বরং সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতির দুর্দশার কথা বলেছে। রামপ্রসাদ সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিভেদেরও প্রতিবাদ করেছেন তাঁর গানের ছত্রে ছত্রে। রামপ্রসাদ লিখেছেন— "কেবা বুকের কেবা পিঠের, বল দেখি মা তাই শুনি। কেহ সারা দিনে পায় না খেতে, কেহ দুধে খায় সাঁচা

চিনি। কেহ শুয়ে তেতলাতে, পালঙ্কে মশারি টানি।/ আমরা মরি শুড় শুড়য়ে, ভাঙা ঘরে নাইক ছা'নি।/ কেহ পরে শাল দোশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া ছালা/ অনুভবে বুঝি তারা, তেলা মাথায় তেল ঢালনি।" রামপ্রসাদের জীবদ্দশায় বাঙালি সমাজ ও বাংলা নানাবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। সবথেকে উল্লেখযোগ্য ১৭৩৯ সালের মহাপ্লাবন, ১৭৪২ ও ১৭৫২ সালের বর্গী হানা, ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ ও ১৭৬৯-র (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তর। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। মানব দরদী সাধক কবি রামপ্রসাদের গানে শোনা গেল, অন্নের জন্য কাতর প্রার্থনা ও মায়ের প্রতি অভিমান – "অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্নদা!" ও "মা মা বলে আর ডাকব না / ও মা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা / ছিলাম গৃহবাসী করিলে সন্ন্যাসী, / আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী। / ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব, / মা বলে আর কোলে যাব না।।" নানা বিপর্যয়ের ভয়াবহ প্রভাব পড়েছিল বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের উপর। সেই সংকট কালে রামপ্রসাদের গান বাঙালিকে কিঞ্চিৎ শান্তি দিয়েছিল। সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছিলেন সমাজ সংস্কারক রামপ্রসাদ। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধাচারণ করে তিনি সতীদাহ প্রথার বিলোপ চেয়ে লিখেছিলেন - "নহে শাস্ত্রসমত্বা সমত্বা সহমৃতা।"

রামপ্রসাদের ঐশ্বরিক দর্শন

রামপ্রসাদ ছিলেন একাধারে সাধক, কবি ও গায়ক। মাতৃসাধনার পাশাপাশি তিনি বাংলা গানের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর গানের ভক্তিরসের আবেদনে শ্মশানবাসিনী, করালবদনী কালী প্রবেশ করলেন আদরিনী শ্যামা মা রূপে বাঙালির ঘরে ঘরে। তিনি এক যুগসন্ধিক্ষণের সমাজ সচেতক কবি। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল দেশমাতৃকার বন্দনা। জাতিভেদ এবং ধর্মান্ধতাকে উপেক্ষা করে এক বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাতৃত্বের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন রামপ্রসাদ। এক উদার ঐশ্বরিক দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন তিনি। -

রামপ্রসাদের রচিত শ্যামাসংগীত হল মা কালী বা মহাশক্তির উদ্দেশে রচিত এক অনন্য ভক্তিগীতি যা শাক্তগীতি নামে বাংলা সাহিত্যে শ্রেণীভুক্ত। রামপ্রসাদের গানে যে মায়ের বর্ণনা রয়েছে – তিনি শ্যামা মা তথা মা কালী এবং শক্তিরূপিণী আদ্যাশক্তি । তিনি চেষ্টা করেছেন শক্তি সাধনাকে নীরস শাস্ত্রাচার ও তান্ত্রিক সাধনা থেকে মুক্ত করে মাটির কাছাকাছি একটি আবেদনপূর্ণ সাংগীতিক প্রার্থনা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার। রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতে মা কালী ভয়ংকর ও উগ্ররূপিণী দেবী নন। তিনি মা, কখনো মেয়ে। তিনি নিজেকে শ্যামা মায়ের ছেলে হিসাবে উল্লেখ করতেন। তাঁর রচিত শ্যামা সংগীতে মা কালীর প্রতি ভক্তিরসে সিক্ত ভালোবাসা, আবেগ, অভিমান, এমনকি রাগও প্রকাশ পেয়েছে । কখনও তিনি মাকে নিজের মেয়ে ভেবে চরম অভিমানে লিখেছেন, "আর তোমায় ডাকব না কালী / তুমি মেয়ে হয়ে অসি ধরে, / ল্যাংটা হইয়ে রণ করিলি / দিয়াছিলে একটা বৃত্তি, / তাও তো দিয়ে হরে নিলি।" কখনও পুত্র রূপে মাকে জানাচ্ছেন তাঁর দুঃখের কথা । কখনো অধর্মে ডুবে যাওয়া দেশ ছাড়তে চাইছেন তিনি, কিন্তু পারছেন না কালী মায়ের পদস্পর্শে পবিত্র ভূমির টানে। তাই তিনি লিখেছিলেন, "আমি এত দোষী কিসে / ওই যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে / মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকব না আর এমন দেশ / কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে।" কখনও রাগ দেখিয়ে মাকে খেয়ে নেওয়ার কথাও বলেছেন, "এবার কালী তোমায় খাব / খাব খাব গো দীনদয়াময়ী / তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার / গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় যে মা-খেকো ছেলে / এবার তুমি খাও কী আমি খাই মা, দুটার একটা করে যাব । আসলে তিনি এই গানটির মাধ্যমে নিজের শরীরের অভ্যন্তরে ভবতারিণী মায়ের উপস্থিতি চেয়েছেন। এছাড়া রামপ্রসাদ লিখেছেন – 'কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হল / যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রল ॥ / মা নিম খাওয়ালে, চিনি বলে, কথায় করে ছল।/ ওমা! মিঠার লোভে, / তিত মুখে সারা দিনটা গেল ॥ / মা খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতল । / এবার যে খেলা খেলালে মাগো, / আশা না পুরিল ॥ / রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, / যা হবার তাই হল । / এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে, / ঘরে নিয়ে চলো ॥ এই গানে মায়ের প্রতি অভিমান জানিয়েছেন, সেই সাথে ছলনার অভিযোগও করেছেন। পরিশেষে আব্দার করেছেন মায়ের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ।

রামপ্রসাদ ছিলেন তৎকালীন সমাজজীবনের প্রতিভূ। আঠারো শতকের মাঝামাঝি ঘোর অরাজকতার সময়ে সাধক রামপ্রসাদ উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মানুষ হলেও সংসার বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন না। তাই বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক সংকটে কাটিয়েছেন। তিনি মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন কাল্পনিক কৃষক সত্তায় - এবার আমি করব কৃষি / ওগো, এ ভব সংসারে আসি। / কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে / বসে দেখো রাজমহিষী,/ দেহজমির জঙ্গল বেশি / সাধ্য কি মা সকল চষি । আর একটি পদ - মন রে কৃষি-কাজ জান না / এমন মানব-জমিন রইলো পতিত, / আবাদ করলে ফলতো সোনা । এই পদে তিনি মানুষকে অনুশীলনের মাধ্যমে জগৎ সংসারের কল্যাণ কর্মে মনোনিবেশ করার কথা বলছেন। তিনি এক কল্যাণকামী শাসন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন। তাই দুঃখ, কষ্ট জর্জরিত মানবজীবনের সমস্ত সংকট থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রার্থনা করেছেন তাঁর আরাধ্য দেবতার কাছে।

রামপ্রসাদ সেন মাটির মূর্তি গড়ে কালী আরাধনা করলেও শাস্ত্রজ্ঞরা মনে করেন তিনি নিরাকারে বিশ্বাসী ও একেশ্বরবাদী ছিলেন। এই ধারণার প্রমাণ মেলে তাঁর কাব্যে — "ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম / তিনভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞা হীন।" ঈশ্বর বিষয়ে আরো সহজ করে বলেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৮২ সালে ২৮ অক্টোবর এক ব্রাহ্ম উৎসবে একজন ব্রাহ্মভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? উত্তরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন "তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী - যেমন বেদান্তবাদী কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার করে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা - স্বপ্নবৎ। জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ / আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।' [তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ – ২।৪] অর্থাৎ বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতেই ভয় থাকে না (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ১৮৮২, ২৮শে অক্টোবর)। "

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘদিনের বন্ধু উইলিয়াম হের্মানন্সকে এক সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করেছিলেন। উইলিয়াম হেমানন্স তার 'Einstein and the poet: in search of the cosmic man' বইয়ে লিখেছেন "He (Einstein) thought that there is a lawgiver" who sets the laws of the universe." (Hermanns, William (1983). Einstein and the poet: in search of the cosmic man. Brookline Village: Branden. p.60)। আইনস্টাইন মহাবিশ্বের চালিকা শক্তি হিসাবে "lawgiver" -এর উল্লেখ করেছেন তাঁর বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারণা থেকে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মহাবিশ্বে একটি সুশৃঙ্খলা রয়েছে, যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রকাশ। একই রকম ভাবে মহাবিশ্বের চালিকা শক্তি হিসাবে "পরম ব্রহ্ম" এর কথা বলেছেন সাধক রামপ্রসাদ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের দেশের বহু মহাপুরুষ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা। তাঁরা বলেছেন "পরম ব্রহ্ম" হলো সর্বশ্রেষ্ঠ **ও** পরম সত্তা, যা সমস্ত বর্ণনা ও ধারণার ঊর্ধ্বে, এবং যা সবকিছুতে বিদ্যমান। একে নিরাকার ও অসীম হিসেবেও বর্ণনা করা হয়।

রামপ্রসাদের ব্যক্তি জীবন

হালিশহরের কুমারহট্ট গ্রামে ১৭২০ সালে সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের জন্মগ্রহণের বহু আগে থেকেই কুমারহট্ট গ্রাম যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিল। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মন্ত্রগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই গ্রামেই বসবাস করতেন। শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান হালিশহরের কুমারহট্ট ছিল উল্লেখযোগ্য স্থান। রামপ্রসাদের পিতা রামরাম সেন ছিলেন প্রখ্যাত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলেও একই পেশা গ্রহণ করুক। তিনি রামপ্রসাদকে সংস্কৃত টোলে পাঠিয়ে ছিলেন জ্ঞান অর্জনের জন্য । মেধাবী রামপ্রসাদ কাব্য, দর্শনশাস্ত্র ও নানাবিধ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বালক বয়স থেকেই রামপ্রসাদকে আকর্ষণ করত আধ্যাত্মিক জগৎ। সেই কারণে আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় তাঁর উৎসাহ ছিলো না । নিরুপায় পিতা উদাসী ছেলেকে সংসারের বন্ধনে বেঁধে রাখতে মাত্র বাইশ বছর বয়সে এক গুণবতী কন্যা সর্বাণীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। পারিবারিক প্রথানুযায়ী বিয়ের পর কুলগুরু মাধবাচার্যের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন রামপ্রসাদ ও সর্বাণী। তাদের চারটি সন্তান ছিল, দুই পুত্রের নাম ছিল রামদুলাল ও রামমোহন

এবং দুই কন্যার নাম ছিল জগদীশ্বরী আর পরমেশ্বরী।রামপ্রসাদের বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। বাবার অকস্মাৎ মৃত্যুর পর সহজ সরল ও সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ কালী উপাসক রামপ্রসাদের সংসারে নেমে এসেছিল চরম দারিদ্র্য। তাই বাধ্য হয়ে কালীসাধনা ত্যাগ করে সেকালে কলকাতার অন্যতম ধনী ব্যক্তি ও মুর্শিদাবাদের নবাবদের কোর্ট জুয়েলার দুর্গাচরণ মিত্রর জমিদারি সেরেস্তায় কেরানির কাজে যোগ দেন। সংসারের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য সেরেস্তায় কাজ নিলেও, সেই কাজে মন ছিল না। তাই আপন মনে স্বভাব কবি রামপ্রসাদ জমিদারি সেরেস্তার হিসাবের খাতা ভরিয়ে ফেলেন অজস্র শাক্ত পদ লিখে। তাঁর এই কীর্তির কথা নালিশের আকারে পৌঁছে গিয়েছিলো দুর্গাচরণের কানে। নালিশ শুনে একদিন সেরেস্তায় খোঁজ নিতে এসেছিলেন দুর্গাচরণ। সেদিন সেরেস্তায় চাপা উত্তেজনা, একজন সামান্য কেরানির এত সাহস যে মনিবের নুন খেয়ে তাঁর সেরেস্তার কাজে ফাঁকি দেয় ! যাঁকে নিয়ে এত অভিযোগ, সেই রামপ্রসাদ এক কোণে অপরাধীর মতো বসে রইলেন। দুর্গাচরণ গম্ভীর মুখে হিসাবের খাতা পরখ করতে শুরু করলেন। দেখলেন হিসেবের খাতার পাতা জুড়ে লেখা আছে অজস্র পদ। একটি পাতায় এসে নবাবের জুহুরি দুর্গাচরণের চোখ আটকে গেল একটি পদে - "আমায় দেও মা তবিলদারী / আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী / পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি / ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরার / শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি / অর্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারী / আমি বিনা মাইনায় চাকর, / কেবল চরণধূলার অধিকারী / যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি হারি / যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে তো মা পেতে পার / প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই লয়ে আমি মরি / ও পদের মত পদ পাই তো, / সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥" দুর্গাচরণ নিজে মা কালীর পরম ভক্ত ছিলেন। তাই পদের ভাবার্থ আত্মস্থ করে তিনি বুঝতে পারলেন রামপ্রসাদ সামান্য ব্যাক্তি নন। রামপ্রসাদের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে, তাঁর ভক্তি ও চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করে দুর্গাচরণ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি রামপ্রসাদকে জানালেন যে তাঁকে আর সেরেস্তায় কাজ করতে হবে না। অনুরোধ করলেন তিনি যেন বাড়ি ফিরে গিয়ে কালী মায়ের সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন। আরো জানান যে তাঁর সংসার যাপনের জন্য মাস মাইনের তিরিশ টাকা প্রতিমাসে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মুক্ত রামপ্রসাদ কালীনাম জপ করতে করতে বিদায় নিয়েছিলেন দুর্গাচরণ মিত্রের সেরেস্তা থেকে।

গ্রামে ফিরে রামপ্রসাদ আবার কালী মায়ের সাধনা শুরু করেন। এই সময় রামপ্রসাদ গুরুরূপে পেয়েছিলেন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ মহাযোগী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে। মহাযোগী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ শ্মশানবাসী মা কালীকে গৃহী মানুষের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, প্রতিমা গড়ে কালী পূজার প্রবর্তক তিনি । তন্ত্রসাধনা ও কালীপূজা পদ্ধতি শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে, তন্ত্রসাধনার জন্য নিজের বাস্তুভিটের কাছেই গাছগাছালিতে ভরা নির্জন একটি স্থান বেছে নিয়েছিলেন রামপ্রসাদ। সেই পঞ্চবটীর ছায়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পঞ্চমুণ্ডির আসন, সেখানেই ডুবে গিয়েছিলেন নিবিড় তন্ত্রসাধনায়। পঞ্চবটীর কাছে এক চালাঘরে নিজের হাতে তৈরি কালী মায়ের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজা শুরু করেছিলেন। তাঁর সারাদিন কাটত মায়ের ধ্যান, পূজা, হোম, যজ্ঞ নিয়ে। মাকে শোনাতেন স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত, আপামর বাঙালির কাছে রামপ্রসাদ সেন হয়ে উঠেছিলেন সাধক রামপ্রসাদা রামপ্রসাদ শ্মশানবাসিনী দেবী কালীকে পৌঁছে দিয়েছিলেন বাঙালির ঘরে ঘরে। তাঁর রচিত, সুরারোপিত ও গীত শ্যামাসংগীতের মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন কালী মায়ের পরম ভক্ত নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও। তিনি সাধক ও গীতিকার রামপ্রসাদকে তাঁর রাজসভায় সভাকবি হিসাবে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন । কিন্তু রামপ্রসাদ রাজার গোলামি করতে রাজি হননি, তাই তিনি সবিনয়ে প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রামপ্রসাদের কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে একশ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন । উদ্দেশ্য ছিল সংসার প্রতিপালনের চিন্তায় যেন রামপ্রসাদের উপাসনায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। প্রতিদানে রামপ্রসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দিয়েছিলেন স্বরচিত প্রণয়কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর"। কাব্যটি পাঠ করে মোহিত হয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদকে দিয়েছিলেন 'কবিরঞ্জন' উপাধি।

রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতে মজে ছিল শুধু আপামর হিন্দুরা নয়, তাঁর গানে মুগ্ধ হয়েছিলেন বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলারও । পরবর্তী কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্রোহী কবি নজরুলও ছিলেন রামপ্রসাদী সঙ্গীত ও ভাবের অনুসারী । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রামপ্রসাদী সুরে বহু গান বেঁধেছেন ।

সাধক রামপ্রসাদের জীবন নিয়ে নানা অলৌকিক কাহিনী শোনা যায় । বিজ্ঞাননির্ভর সভ্যতার কাছে অবাস্তব মনে হলেও, সেসব কাহিনী ভক্তকুল বিশ্বাস করেন ভক্তিরসে সিক্ত হয়ে। কাহিনীগুলির বেশিরভাগই লোকমুখে প্রচারিত। যার মধ্যে স্বয়ং মা কালীর বেড়া বাধায় সহায়তার কাহিনী অন্যতম। সেই জনপ্রিয় কাহিনীটি এই রকম – একবার রামপ্রসাদের ভিটের বেড়া প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভেঙে গিয়েছিল। নিজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধতে শুরু করেছিলেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গিয়েছিল বেড়া বাঁধতে বাঁধতে। মেয়ে সেই কাজে বিরতি নিয়ে অন্য কাজে গিয়েছিলো। বেড়া বাঁধতে থাকার সময় রামপ্রসাদ আনমনে গান গাইছিলেন তাই টের পাননি যে তার মেয়ে বেড়ার ওপাশে নেই। কারণ বেড়ার অপরদিক থেকে বেড়া বাঁধার দড়িটি ফিরে ফিরে আসছিল। কাজ থেকে ফিরে এসে তাঁর মেয়ে দেখেছিল বেড়া বাঁধার কাজ প্রায় শেষ। বিস্মিত হয়ে সে রামপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করেছিল, রামপ্রসাদ কীভাবে একা এতখানি বেড়া বেঁধে ফেললেন। রামপ্রসাদ তখন বুঝতে পেরেছিলেন স্বয়ং মা কালী এসেছিলেন, তাঁকে সাহায্য করতে। এতকাছে এসেও দেখা দিলেন না আরাধ্যা কালী মা। এই আক্ষেপে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন রামপ্রসাদ। আরেকটি জনপ্রিয় গল্পে রামপ্রসাদের বারাণসীর দেবী অন্নপূর্ণার দর্শনের কথা বলা হয়েছে । এছাড়া আছে রঘু ডাকাতের কাহিনী, আছে গাব গাছে পদ্মফুল ফোঁটার কাহিনী।

রামপ্রসাদের মৃত্যুর বিষয়েও একটি লোককাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে ১৭৭৫ সালে রামপ্রসাদের মৃত্যু হয় । বৃদ্ধ বয়সে, রামপ্রসাদের দেখাশোনা করতেন তাঁর পুত্র রামদুলাল এবং পুত্রবধূ ভগবতী। তাদের সহায়তায় প্রতি বছর কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা করতেন। দীপাবলির রাতে সারা রাত ধরে গানও গাইতেন । প্রতি বছর সেই পূজার রাতে বহু ভক্ত সমাবেশ হতো । ১৭৭৫ সালেও দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথিতে তেমনি কালীপূজার আয়োজন হয়েছিল । পূজা শেষ হলে সকালে মায়ের মূর্তি নিয়ে রামপ্রসাদ গঙ্গায় নেমেছিলেন, কিন্তু আর ফিরে আসেননি । কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময়কালটি ঠিক নয়। পরবর্তী কালে প্রমাণ মিলেছে যে রামপ্রসাদ ১৭৯৪ সালের এপ্রিল মাসেও জীবিত ছিলেন। ১২০১ বঙ্গাব্দের, বৈশাখমাসে (এপ্রিল, ১৭৯৪) কলিকাতা ও হালিশহরের জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের এক কবুলতিপত্রে (অঙ্গীকারপত্র) ইসাদী (সাক্ষী) হিসাবে সাধক রামপ্রসাদ সেন সই করেছিলেন। তাই এটা নিশ্চিত যে ১৭৯৪ সালের এপ্রিল মাসের পরে ৭৪-৭৫ বছর বা আরো বেশি বয়সে তিনি মারা যান। তার স্বাক্ষরিত কবুলতিপত্র বেহালার বড়িশায় সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পারিবারিক সংগ্রহশালাতে সংরক্ষিত রয়েছে।

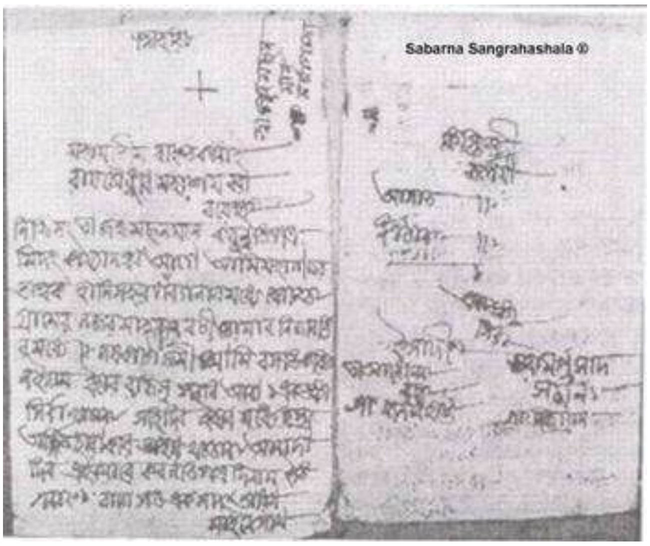

সাধক রামপ্রসাদ সেনের স্বাক্ষরিত কবুলতিপত্র (সৌজন্যে সাবর্ণ সংগ্রহশালা)

উপসংহার

রামপ্রসাদ তাঁর রচিত অসংখ্য পদাবলীর মাধ্যমে যাবতীয় জাগতিক দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্য 'কালীনাম' জপ করার পরামর্শ দিয়েছেন - কালীর নাম বড় মিঠা / সদা গান কর পান কর এটা / ওরে ধিকরে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা ⁄ নিরাকার সাকার ককার, / ককার সবাকার ভিটা। / ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, / ইহার পর আর আছে কেটা।।/ কালী যার হৃদে জাগে, / হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।/ সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, / কালে দিয়ে হাততালিটা / জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে ধর্মাধর্ম কর ঘিটা / তুমি মনকর বিল্বদল,/ স্রুব কর যত্ন যেটা / প্রসাদ বলে হৃদিভূমির বিরোধ মেনে গেল মিটা। / আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর, । দেবোত্তরে দাগা চিঠা। এই পদটির মধ্যে দিয়ে তিনি উন্নততর আধ্যাত্মিক জীবনের কল্পনা করেছেন ! জাগতিক নিপীড়নের অস্তিত্বহীন জগতের স্বপ্ন দেখেছেন। কল্পনার আলোকে কালী মায়ের উপাসক সাধক রামপ্রসাদ তার কাব্যে এক মুক্ত মানব জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন । সচেতন মানুষ সেই কল্পিত জগতে উত্তরণের আশায় সাধক রামপ্রসাদের ভক্তিবাদ আজও অনুসরণ করে। ঈশ্বরের শক্তিকে মাতৃরূপে সাধনার জন্য সাধক রামপ্রসাদ আজও অমর হয়ে আছেন।

সাধক পুরুষ রামপ্রসাদের প্রত্যাশিত সেই মুক্ত মানব জীবন আজও অধরা । বর্তমান সময়ে দুনিয়া জুড়ে মানুষ মুক্ত মানব জীবন অর্জনের পথের দিশা হারিয়ে, ক্রমেই অর্থ ও ক্ষমতার আস্ফালনে মেতে উঠছে । অস্ত্রের ঝনঝনি বাজিয়ে নরমেধ যজ্ঞ চলছে পৃথিবী জুড়ে। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশেও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার অভাব দেখা যাচ্ছে। মিথ্যাচার ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের কারণে মানুষ বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। চরম শোষণের কারণে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছে। খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্রমেই মহার্ঘ হচ্ছে। বেঁচে থাকার লড়াই ও অসম প্রতিযোগিতায় মানুষের মুল্যবোধ আজ নিম্নগামী । ভোগবাদী স্বার্থপরতায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই গ্রহের ভবিষ্যতও আজ অনিশ্চিত। মহাপুরুষদের দেখিয়ে দেওয়া পথে কঠোর সংযমের মধ্য দিয়ে বর্তমান সভ্যতা, জীবজগৎ ও পরিবেশ রক্ষার দায় মানুষকে নিতেই হবে। মানব সভ্যতা বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজ এখানে এসে পৌঁছিয়েছে । হয়তো বর্তমান খুবই কঠিন, কিন্তু যখনই মানব সভ্যতা এই রকম সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, ততবারই উদিত হয়েছে নতুন ভোর একদল সাহসী ও বিবেকবান মানুষ দাঁড়িয়েছেন মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা রক্ষার স্বার্থে, গেয়েছেন মানবতার জয়গান ।

নানা রঙে রাঙা বসন্ত বাহার

উৎপলা পার্থসারথি

ঋতুরাজ বসন্তের পদার্পণ হলো। মাঘের শীতের তীব্রতায় যখন প্রকৃতিসহ মনুষ্যকুল ও জীবজগৎ কাবু, ঠিক তখনই আগমন ঘটে ঋতুরাজ বসন্তের। ফাগুনের হাওয়ায় উৎসবের রঙে মেতে উঠে প্রকৃতি। শীতে বৃক্ষের পত্ররাজি ঝরে পড়ে, প্রকৃতিতে আসে স্তব্ধতা। বসন্তের আগমনে আড়মোড়া ভেঙ্গে সেই প্রকৃতি হয়ে উঠে সজীব। বসন্তের আগমনধ্বনি পাওয়া যায় গাছের নতুন কুঁড়িতে। এক অনিন্দ্য সজীবতা, উচ্ছ্বাস আর আনন্দের পূর্ণরূপ নিয়ে শোভিত হয় বসন্তে। ষড়ঋতুর বাংলায় বসন্ত বাংলা বছরের সর্বশেষ ঋতু হলেও বসন্তকে ঘিরেই যাবতীয় উচ্ছ্বাস বাঙালির।

কবি যা কিছু রচনা করেন তাই কবিতা। কবিতার বিষয় বস্তু আর কবির ভাবাবেগ প্রতিবিম্বিত হয় কবিতার পংক্তিমালায়। একথা সত্য যে কবিতার স্রষ্টা কবি, তবে কবিতা? এতো কবির আনন্দ বেদনার হৃদয়জাত অনুভূতির বহিপ্রকাশ যা সুনির্বাচিত শব্দের মাধ্যমে চিত্রায়িত করেন কবি নিজে। মানুষ যে প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠে মানবজীবনের ওপরে তার অবিচ্ছেদ্য ছায়া পড়ে। তাই বংলাদেশের কবিদের প্রকৃতি এবং ঋতু নিয়ে অনেক রচনা আছে যেখানে তাদের চারপাশের পরিবেশ গাছপালা পাহাড় পর্বত, নদী, নালা সব কি সুন্দর করে আঁকা হয়েছে যা পড়ে ও শুনে আমাদের সাধারন মানুষদের মন প্রান জুড়িয়ে যায় আর ক্ষনিকের জন্য হলেও অন্য ভাবজগতে নিয়ে যায়।

তাইতো সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত।/শান-বাঁধানো ফুটপাতে/পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ/কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে/হাসছে...' কোনো কোনো গদ্যকার বসন্তকে আখ্যা দিয়েছেন বিচ্ছেদের ঋতু বলে। কোনো কবি বসন্তকে দেখেছেন কামের ঋতু হিসেবে, আবার কোনো কবি বসন্তকে অভিহিত করেছেন আগ্রাসী ঋতু হিসেবে। বাংলা কবিতায় বসন্তের আগমনী বার্তা প্রথম পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাঙালি কবি আলাওলের কবিতায়। আলাওল কাব্যে বসন্তকে দেখেছেন কামের ঋতু হিসেবে।কুসুমিত কিংশুক সঘন বন লাল।/পুষ্পিত সুরঙ্গ মল্লি লবঙ্গ গুলাল॥/ভ্রমরের ঝঙ্কার কোকিল কলরব।/শুনিতে যুবক মনে জাগে মনোভব॥'

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু বর্ষা হলেও বসন্তের আগমনধ্বনি পাওয়া যায় তার অজস্র গানে কবিতায়। বসন্তের কবিতা বা গানে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিই সবচেয়ে বেশি।রবীন্দ্রনাথের মোট ২ হাজার ২৩২টি গানের মধ্যে প্রকৃতি পর্বের গান আছে ২৮৩টি। এর মধ্যে বসন্ত পর্যায়ের গানের সংখ্যা ৯৮টি। বসন্তের চেয়ে কেবল বর্ষা পর্যায়ের গানের সংখ্যাই বেশি, ১২০টি। রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গানে লিখেছেন, ' আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।/তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে/কোরো না বিড়ম্বিত তারে।/আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো, /আজি ভুলিয়ো আপনপর ভুলিয়ো, /এই সংগীত-মুখরিত গগনে/তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।'এ বসন্তের গান সব বাঙালীর বড় প্রিয়, এরমধ্যে একটা উদারতা, একটা সামগ্রিক ভাব দেখা যায়, যা বলে আনন্দ সবার জন্য - বিভিন্ন জাত ধর্ম বর্ণ সবাই এসো এসে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যকে মন-প্রান ভরে উপভোগ করো।

আবার "নীল দিগন্তে ফুলের আগুন লাগল" কি অসাধারণ তুলনা, পলাশের লাল রংয়ের তুলনা কবি ছাড়া আর কার লেখায় থাকতে পারে। আবার -

"আকাশে বহিছে প্রেম, নয়নে লাগিল নেশা
কারা যে ডাকিল পিছে! বসন্ত এসে গেছে
মধুরও অমৃত বানী, বেলা গেল সহজেই
মরমে উঠিল বাজি; বসন্ত এসে গেছে"

– মানবজীবনে বসন্তের একটা অদ্‌ভুত প্রভাব রয়েছে, মিষ্টি ফুলের সুগন্ধিযুক্ত মৃদু হাওয়া এবং গাছে,গাছে লাল, সাদা ও রং-বেরঙের ফুল মানুষকে ক্ষনিকের জন্য হলেও পাগল করতে বাধ্য হয়। ভাবতে অবাক লাগে প্রেম, বিরহ, আনন্দ সমস্তরকম অভিব্যক্তি একজন কবির মনে কি ভাবে একসাথে প্রস্ফুটিত হয়? বিশ্ববরেণ্য কবিদের মনের এই প্রাচুর্যই তাদের কবিতাকে মানবজীবনের একটি অমূল্য সম্পদ করে তুলতে সাহায্য করেছে ।

কাজী নজরুল ইসলাম ও কম যাননি বসন্ত বন্দনায়। লিখেছেন, 'বসন্ত এলো এলো এলো রে/পঞ্চম স্বরে কোকিল কুহুরে/মুহু মুহু কুহু কুহু তানে…'।জীবনানন্দ দাশের প্রিয় ঋতু হেমন্ত হলেও তার কবিতাতেও পাওয়া যায় বসন্তকে। "পাখিরা" কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'আজ এই বসন্তের রাতে/ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;/ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,/স্কাইলাইট মাথার উপর,/আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর…'।

অবশ্য বসন্তকে ঋতুরাজ হিসেবে স্বীকার করার পক্ষে নন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। তিনি বসন্তকে বলেছেন বিচ্ছেদের ঋতু। "অনিমেষ একা" জার্নালে তিনি লিখেছেন 'বসন্তকে ঋতুরাজ বলার পক্ষে আমি নই। এ ঋতুতে প্রথম আমি প্রেমে প্রত্যাখাত হই। রাতের ময়দানে হাওয়া বইছিল, আকাশে তারা ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল গুটিবসন্ত ছেয়েছে আমাকে। ফিরে ফিরে বঙ্কিমের রোহিনীর মুখ ভেসেছিল। বসন্ত যেন হারানোর এক হাওয়া, বইয়ে দেওয়া সময়।'– তবে এখানে এটাই দেখা যায় যে যদিও তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন বসন্তের প্রেমময় উপস্থিতি তবুও বিরহ যন্ত্রণা তো প্রেমেরই আরেক অনুভূতি ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও একই মত। বিখ্যাত উপন্যাস "কৃষ্ণকান্তের উইল"–এ তিনি লিখেছিলেন, 'কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কী যেন হারাইয়াছি। যেন তাই হারাইয়া যাওয়াতে জীবনসর্বস্ব অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। যেন তাহা আর পাইব না। যেন কী নাই। কী যেন হইল না। কী যেন পাইব না।"বসন্ত ঋতুর অন্যতম উৎসব বসন্ত উৎসব বা হোলি যা যতই রঙ্গিন হোক না কেন, এর আসল অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম–বিরহ এবং মিলনকে উপস্থাপিত করেই। আবির খেলার মধ্যে যতই উচ্ছাস থাক, ওটাকে কিন্তু আমরা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবেই গণ্য করি।

আবার কবি নির্মলেন্দু গুণ বসন্তকে আগ্রাসী ঋতু হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি কবিতায় বলেছেন, বসন্তকে এড়ানোর সাধ্য নেই কারো। চোখ ফেরানো যাক তার লেখা কবিতা "বসন্ত বন্দনা"য়। কবি এখানে বলছেন, 'এমন আগ্রাসী ঋতু থেকে যতই ফেরাই চোখ,/যতই এড়াতে চাই তাকে, দেখি সে অনতিক্রম্য।/বসন্ত কবির মতো রচে তার রম্য কাব্যখানি/নবীন পল্লবে, ফুলে ফুলে। বুঝি আমাকেও শেষে/গিলেছে এ খল–নারী আপাদমস্তক ভালোবেসে।' বসন্ত যে কেবলই কাব্য আর কবিতা, তা কিন্তু নয়। বসন্তের মাঝে লুকিয়ে থাকে জাগরণের ধ্বনিও। বসন্ত কখনো বা হয়ে উঠে দ্রোহের প্রতিমূর্তি। বসন্তকে কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান দেখেছেন দ্রোহের প্রতিমূর্তি হিসেবে। তার ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা কালজয়ী উপন্যাস "আরেক ফাল্গুন"– এ পাওয়া যায় নতুন করে জেগে উঠা, মাথা তুলে দাঁড়ানোর আখ্যান।

বসন্ত যেন বারবার বাঙালির জীবনে ফিরে আসে হারানো অধিকার ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ের অনুষঙ্গ হয়ে। ৯ই ফাল্গুন বাংলার ছাত্র যুবকরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে অকাতরে বিলিয়েছে আপন প্রাণ। বসন্তের প্রথম দিনেই মজিদ খানের কুখ্যাত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়েছিল। পলাশরাঙা বসন্তের প্রথম দিনেই জয়নাল, জাফর, কাঞ্চন, দীপালিদের রক্ত মিশেছে রাজপথে।তাই বাংলার বসন্ত কখনো উৎসবের, কখনো বিচ্ছেদের, কখনো বিষাদের, আবার কখনোবা সংগ্রামের। বসন্তকে এড়ানোর সাধ্য নেই কারো।

মাছের যাপন চিত্র

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

প্রাণীকুল যখন প্রকৃতিতে আবর্তন ও বিবর্তনের খেলার সাথী, তখন প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে জীবনকে ভালোবেসে এগিয়ে নিয়ে চলার যে শক্তি থাকে তাকে জীবনিশক্তি বা জীবনবোধ, যাকে সংক্ষেপে 'বোধ' বলি। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে জীবনবোধ ভবিষ্যতের ধারক ও বাহক। এটি এমন একটি ক্ষমতা যা সময় ও গতিকে ত্বরান্বিত করে। তবে 'বোধ' শান্তি বা ভালোবাসার প্রশস্ত পথ হলেও অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। জীবনে মূল্যবোধের আঙ্গিকে 'জীবন বোধ' প্রবহমান।

প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছ স্বাভাবিকভাবেই এসবের ব্যতিক্রম নয় এবং সেখানেও সুচারুভাবে তার প্রকাশ আমরা দেখি বংশপরম্পরায়। আমাদের দেশে বনজ সম্পদকে বাদ দিলে, জলজ জৈব সম্পদে আমরা অতি সমৃদ্ধ; এক হাজারের বেশি প্রজাতির মাছ আছে আমাদের দেশে। তারই মধ্যে অতি পরিচিত দশটি মাছকে নিয়ে এই আলোচনা ; যেখানে এইসকল মাছগুলির আচার-ব্যবহার আমাদের জীবনবোধের সাথে জড়িয়ে আছে কোন না কোনভাবে।

ইলিশ : বাঙালি আর ইলিশের এক আদি অকৃত্রিম যোগ। আমাদের দেশের একমাত্র পরিযায়ী মাছ হল ইলিশ। নামটির গরিমা এমনই যে আমাদের আবেগ ও আস্থা এই মাছটির সাথে জড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের তিনদিকেই সাগর ও মহাসাগর। ইলিশ প্রতি বছর বঙ্গোপসাগর দিয়ে মোহনা হয়ে হুগলী নদী পথে প্রবেশ করে এবং ডায়মন্ড হারবার, বলাগড়, ফারাক্কা এরকম কিছু জায়গাই তাদের পছন্দের ডিম পাড়ার জায়গা। ইলিশের কর্ণগহ্বর/ কানকোতে থাকা অটোলিথের উপর আইসোটোপ বা সমস্থানিক প্রয়োগ করে এদের নোনাজলে এবং মিষ্টি জলে কাটানো সময়ের সঠিক তথ্য জানা যায়। মিষ্টি জলে ডিম পাড়ার পর নিষিক্ত ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা ডিমপোনারা বিভিন্ন অণুশৈবাল ও রটিফার খেয়ে বড়ো হয় এবং ক্রমে ধানী ও চারাপোনাতে রূপান্তরিত হয়। আরো বেড়ে ওঠে পাঁচ-ছয় মাসে এবং সেই সঙ্গে অর্জন করে লবণ সহনশীলতা—মোহনায় কিছুদিন কাটিয়ে আবার যাত্রা করে সমুদ্রে। ইলিশের এই সহনশীলতা—কখনও নোনাজল আবার কখনও মিষ্টি জল—সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক। এত চাপ নিয়েও সে সুন্দর ও পুষ্টি সমৃদ্ধ থেকে নিজেকে এক অনন্য জায়গায় ধরে রাখতে পেরেছে এবং তার এই এতো পরিশ্রম পুরোটাই তার পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভেবে। সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলার এক অসাধারণ বার্তা বহন করে চলে ইলিশের জীবন।

কই : যে কোনো বাঙালি পরিবারে কই মাছ অতি পরিচিত। রসনা তৃপ্তিতে এই মাছের বিভিন্ন পদ বেশ জনপ্রিয় বরাবরই। এর চাষ পদ্ধতি, পুষ্টিগুণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা না করেও বলা যায়, অনুপ্রেরণার আর একটি নাম হল কই মাছ। জীবনের বহু কিছু থেকে আমরা সংগ্রহ করতে পারি জীবনে এগিয়ে চলার মন্ত্র—যা জীবনের সারবত্তাও বটে। কই মাছ দেখলেও আশার সঞ্চার হয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে একে রাখা হোক না কেন, সে জলে-তা বেশি বা কম যাই হোক না কেন, বা ডাঙ্গায় অর্থাৎ বিনা জলে; সে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। ডাঙ্গায় স্থান না হলে, গাছেও চড়তে পারে (অনেক সময় তাই একে Climbing perch-ও বলে। একে আঘাত করলে, ছুরি বা দিয়ে কাটলে এমনকি গরম তেলে ছেড়ে দিলেও সে সহজে মরতে চায় না। 'মরার আগে মরবো না' এই মন্ত্রে সে দীক্ষিত। এই যে আকুলতা, যে কোনো পরিস্থিতি সামলে দিয়ে বাঁচার তাগিদ—কোনো প্রতিকূলতাই যে বাধা হতে পারে না জীবনে এগিয়ে চলার পথে—এই সত্য কই মাছের জীবন মনে করিয়ে দেয়। নির্বাক থেকেও ছোট্ট একটি মাছ যে মনের জোরে কিভাবে আমাদের আদর্শ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তিলাপিয়া : সাধারণ মানুষের জন্য অসাধারণ বেশ কিছু মাছ যা আছে তার মধ্যে তিলাপিয়া অন্যতম। বহুকাল এটি ব্রাত্য ছিল, যাই হোক সেই অসুবিধা আর নেই এখন। উন্নতমানের (GIFT: Genetically Improved Farmed Tilapia **)** তিলাপিয়া এখন সর্বত্র মেলে। যে কোনো জলাশয়ে তিলাপিয়া চাষ করা যায়

শুধু নয়, এদের খাবার নিয়েও বিশেষ চিন্তা করতে হয় না, চাষের খরচ কম, তাই তুলনামূলকভাবে বাজারে কিছুটা কম দামেই পাওয়া যায়। তিলাপিয়া মাছের অভিভাবকত্ব এক অসাধারণ গুণ। এই মাছের মতো বাচ্চাদের যত্ন নেওয়া খুব কম মাছের মধ্যে দেখা যায়। যখন এদের বাচ্চারা খেলছে, তখন এদের বাবা-মা উভয়ই অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে। কোনো বিপদ বুঝলেই বাচ্চারা বাবা-মা-এর মুখের মধ্যে প্রবেশ করে, আবার প্রতিকূল অবস্থা দূর হলে তারা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। এই চমৎকার অভিভাবকত্ব এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ কর্তব্যপরায়ণতায় বিশেষ করে সন্তান পালনের ক্ষেত্রে এই মাছের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ল্যাটা : মিষ্টি জলের বায়ুশ্বাসী এই মাছটির মুখের সাথে সাপের মুখের মিল থাকায় অনেকে একে 'স্নেকহেড -ও বলেন। এই মাছটি যে কোনো প্রতিকূলতা সহ্য করে বাঁচতে পারে। প্রখর গ্রীষ্মের তাপে পুকুরের/খাল-বিলের জল শুকিয়ে গেলে এই ল্যাটা মাছ অনেকদিন পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে নিজেকে গর্তের মধ্যে বনবাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে নিতে পারে। কোনো খাবার গ্রহণ না করেও বাতাসের অক্সিজেন নিয়ে শরীরের পাঁকাল মাছের মতো থাকতে হয়। মাছও যে মানুষের বিপাক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে সন্ন্যাস জীবনযাপন করতে পারে, জীবনশৈলীতে উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে তা এর আগে আবার জল ভরে গেলে তারা স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতির নিরিখে বেঁচে থাকার জন্য নিজের পরিবর্তন প্রয়োজন, জীবনের এক কঠিন বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে ল্যাটা ।

ক্লাউন ফিস : সামুদ্রিক (ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে) এই ছোট্ট উজ্জ্বল কমলা রং, সঙ্গে তিন সাদা ব্যান্ড-কানো লাইনিং সহ এবং লেজ ও পাখনায় সরু কালো মার্জিনওয়ালা মাছটির একটি বিশেষত্ব যে এরা কেবল পুরুষ মাছ হয়েই জন্মায়—জীবনে একবারই মাত্র এদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে স্ত্রী মাছে রূপান্তরিত হতে পারে; তখন সেই স্ত্রী মাছ অসাধারণ রাশভারী স্বভাবের হয়ে যায়। সে ডিম ছাড়ে এবং নিষিক্ত হবার সময় থেকেই পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। বাবাকে। এদের ডিম ফুটে ডিমপোনা বেরিয়ে আসার জন্য প্রচুর অক্সিজেন দরকার হয় এবং এই দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘাটতিও একটি সাধারণ ঘটনা যার জন্য বাঁচার হার কম হয়। পুরুষ মাছটি অর্থাৎ বাবার দায়িত্ব অনবরত মুখ দিয়ে বাতাস ছেড়ে ডিমগুলিকে প্রস্ফুটিত করানো ও তারপর বেশ কিছুদিন দেখভাল করা নিজের কড়া তত্ত্বাবধানে। পিতৃকর্তব্য পালনে যে নিষ্ঠা ক্লাউন ফিসে দেখা যায় তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বাবা হওয়া যে সহজ নয় এবং বাবা মানেই দারুণ দায়িত্ববোধ তা এই মাছকে দেখে শেখা যায়।

পাঁকাল : আমাদের দেশীয় ছোট মাছগুলির মধ্যে অতি সুস্বাদু এবং প্রোটিন গুণমানে সমৃদ্ধ একটি মাছ হল পাঁকাল । চাষ কমই হয় এই মাছটির, যেটুকু বাজারে পাওয়া যায় তা প্রায় সবটাই প্রকৃতিজাত । প্রকৃতিতে এদের পাঁকের মধ্যে জলাভূমিতে পাওয়া যায়। পাঁক ও কর্দমাক্ত জলের তলদেশে থাকলেও রোগ সংক্রমণ এদের হয়না বললেই চলে। এদের গায়ে আঁশ থাকে না, তাই রোগ সংক্রমণ সহজেই হতে পারতো কিন্তু সে এমনভাবে ঐ পরিবেশেই নিজেকে মানিয়ে নিয়ে থাকে; বাড়- বৃদ্ধি, প্রজনন সবই হয় ঐ পাঁক পরিবেশেই অথচ এই মাছটিকে যখন ধরা হয় দেখা যায় কত মসৃণ, উজ্জ্বল এদের দেহ; শরীরে কোথাও পাঁক লেগে নেই। হয়তো এই পাঁকাল মাছের জীবনশৈলী দেখেই রামকৃষ্ণদেব তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন—সংসারে পাঁকাল মাছের মতো থাকতে হয়। মাছ ও মানুষের জীবনশৈলীতে উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে তা এর আগে আমাদের অজানা ছিল। নিজের মনের একাগ্রতায় নোংরার (পাঁকের) প্রভাবকে সে সুন্দরভাবে এড়াতে পেরেছে ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আঁশহীন মসৃণদেহের অধিকারী পাঁকাল মনুষ্য জীবনে লোভ, পাপ এসকল পাঁককে দূরে সরিয়ে রেখে সুন্দর জীবন দর্শন বেছে নেওয়ার বার্তা পাঁকাল মাছের জীবন কিন্তু বয়ে নিয়ে চলে ।

সি-হর্স : সাগরের প্রাণীজগতে এক অভিনবত্বের দাবি রাখে সামুদ্রিক ঘোড়া বা সি-হর্স' বা হিপ্পোক্যাম্পাস নামের মাছটি। অবয়বে ঘোড়ার সাথে খানিকটা সাদৃশ্য আছে। আবার ক্যাঙ্গারুর মতো পেটে থলিও আছে এর। এই মাছের বাহারি লেজটি সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে—যখন ইচ্ছে যে কোন জলজ গাছকে জড়িয়ে নিয়ে কেতাদুরস্তভাবে বিশ্রাম নেয়। এর বাহারি নাকটি অদ্‌ভুত সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। পুরুষ সি-হর্সকে মিস্টার মম' নামে অভিহিত করা হয় কারণ এদের পুরুষরাই সন্তান পালনের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। স্ত্রী ডিম পাড়ার পর ও তা নিষিক্ত বা সম্পৃক্ত হলে পুরুষ তার থলিতে ডিমগুলি রাখে—

সেখানে রক্তজালিকার মাধ্যমে ডিমগুলি পুষ্টি সমৃদ্ধ হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই সদ্যোজাতরা চলাফেরার অবস্থায় আসে, ক্রমে আরও পূর্ণতা পার ও বাবার তত্ত্বাবধান ছেড়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা শুরু করে। মায়ের অনুপস্থিতিতে সন্তান প্রতিপালন, এ এক বিশাল বড় দায়িত্ব এবং তা অতি সফলতার সঙ্গে পালন করে চলে পুরুষ সি-হর্স। জীবনের এক অতি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যদি মা না থাকেন সেক্ষেত্রে কর্তব্য পালন করে চলার বার্তা বয়ে নিয়ে আসে।

রাস (Wrasse) : সমাজে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে গেলে আমাদের যেমন ডাক্তারবাবুকে দরকার, তেমনই মাছদের মধ্যেও বিশেষ করে অল্প সংখ্যক মাছ যারা গভীর জলে বসবাস করে তাদেরও অসুস্থতায় এমন কিছু ডাক্তারের প্রয়োজন হয়। এরকম এক ডাক্তার মাছ হলো ল্যাবরয়ডেস ডিমিডিয়েটাস যার ডাক নাম রাস। কখনও পরজীবির আক্রমণে, এখনও বা ব্যাক্টেরিয়া/ ছত্রাকের সংক্রমণে যখন তারা আক্রাত হয়, বিশেষ করে পরজীবি উকুনের উৎপাত বেশি হলে তারা চলে আসে রাসদের কাছে। এই ডাক্তার মাছ খুঁটেখুঁটে সেগুলিকে খায় - ওদের ও হয় উদরপূর্তি। এছাড়া সংক্রমণের ফলে ঘা হলে পুঁজ,রক্ত,ঘায়ের মাংস সব এরা খুঁটেখুঁটে খেয়ে নেয়। এভাবে সংক্রমিত মাছটির রোগমুক্তি ঘটে। যখন রোগীর চাপ বেশি থাকে তখন ডাক্তার মাছের স্ত্রী/সঙ্গিনী ও ছুটে আসে এই চিকিৎসায় অংশ নিতে। এইভাবেই চলে মিথোজীবিতা। সমাজে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার প্রয়োজন, এই বার্তা দিয়ে যায় রাস এক নিপুণতার সাথে।

ইল : লম্বা নলের মতো আঁশহীন মসৃণ দেহ-বিশিষ্ট ইলের জীবন ভারী অদ্ভুত। মূলত আমেরিকা ও ইউরোপের মিষ্টি জলের এই মাছ সারা বছর কেন আরও বেশী সময়ও কাটাতে পারে নদীতে। তারপর যৌবনের জোয়ার এলে যাত্রা করে মহাসাগরের দিকে রাতের অন্ধকারে। ক্রমশ সমুদ্রের গভীরে চলে যায়—একটু জিরিয়ে নিয়ে ডিম পাড়ে, ডিম ফোটার পর শিশু ইলে ঐ জায়গাটি ভরে ওঠে। এই শিশু মাছগুলির সাথে পরিণত ইলের আকার-প্রকারের কোন মিলই নেই। সেইজন্য বহুকাল মনে করা হতো এগুলি অন্য কোনো মাছ; যা পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয়। এই শিশু মাছগুলির দেহ চ্যাপ্টা, স্বচ্ছ এবং দেহের তুলনায় মাথা অতি ছোটো। ক্রমশ তারা বড়ো হয়ে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল ক্রমশ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে পৌঁছায় আর যেগুলি ইউরোপিয়ান অরিজিনের, সেইসব ছানাপোনাগুলি ইউরোপ অভিমুখে রওনা হয় এবং ঠিকঠাক পৌঁছেও যায়—কোনো ব্যতিক্রম হয়না, ইউরোপিয়ান ইল ইউরোপে এবং আমেরিকান ইল আমেরিকায় পৌঁছে যায় এবং সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ধীরে ধীরে এদের আকৃতি বদলায়। ক্রমশ লম্বা হয়, রঙ বদলে যায় এবং পূর্ণাঙ্গ ইলে পরিণত হয়। জীবজগতে এরকম আশ্চর্য ঘটনা হয়তো খুব কমই আছে। এইরকম অভিযান চালিয়ে ঘরে ফেরা যে কতো কষ্টসাধ্য, এদের জীবনধারা দেখলে বোঝা যায়। ইল মাছের এই সহজাত প্রবৃত্তি বংশ পরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। ইল মাছের এই রহস্য উদ্ঘাটন নিশ্চয়ই একদিন হবে এবং কিভাবে মনের জোরে পূর্বপুরুষের গুনসহ সে নিজের জায়গায় ফিরে আসে তাও জানা যাবে। আজকের দিনে আমাদের অনেকেই গুরুজনদের দেখানো পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই, কিন্তু ইল মাছ প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের বাবা মা'দের দেখানো পথেই সাঁতরে চলেছে, যার থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে।

লেখাটি শেষ করি জীবনের আরো এক বোধ দিয়ে যা আমাদের শিখিয়ে চলেছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি নদীর বেশ কিছু মাছ। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী নদীগুলিতে প্রায়শই দেখা যায়, কিছু মাছ স্রোতের বিপরীতে এগিয়ে চলেছে। তবে বুদ্ধি খাটায় এরা, যে সব জায়গা দিয়ে নদীর জল অপেক্ষাকৃত কম জোরে বহে চলে, সেই জায়গা দিয়েই ওরা চলাচল করে হয়তো বা প্রজননের তাগিদে বা হয়তো একান্ত স্থানে নিরুপদ্রব কাটানোর জন্য।সামান্য মাছের যাই হোক না কেন, স্রোতের বিপরীতে ও যে জীবনে কখনও কখনও যেতে হতে পারে - শারীরিক কষ্ট করেও, তাও একপ্রকার দৃঢ় মানসিকতার পরিচায়ক। সামান্য মাছ ও যে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, নিষ্ঠা ভরে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, এটা শিক্ষণীয় হতে পারে আমাদের জীবনে।

এক বীভৎস, নৃশংস হত্যাকান্ড ও আমি

চৈতালি দত্ত

না, না! অমন বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকাবেন না, প্লিজ। হত্যাকান্ডটি যখন ঘটেছিল, সেই আগস্ট মাসে, এবং এখনও আমি দেরাদুনে আছি আর এই পরিকল্পিত ঘটনাটি ঘটেছে একদা আমার প্রাণের শহর কলকাতায়। তবে এখানে 'আমি' এলাম কোথা থেকে? –এই প্রশ্ন জাগছে তো মনে?

দাঁড়ান! এখনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। হ্যাঁ, যদিও এখন এ শহরে বাস করি না – তবুও জীবনের প্রথম কিছুকাল শুধু এই শহরের প্রেমে আমি মগ্ন ছিলাম, এর গরবেই গরবিনী ছিলাম আমার বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের নানা রঙের দিনগুলি ছিল এ শহরের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে সানন্দ পদচারণার। সেখানে কোনদিনও মনে কোন ভয়, সংশয় বা সন্দেহের উদয় হয়নি। শিক্ষক হিসাবে যাঁদের আমরা পেয়েছিলাম, তাদের অনেকের জীবদ্দশায় আমরা যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম বলে নিজেদের ধন্য মনে করি।

পরবর্তীকালে কলকাতায় ক্রমশ দেখতে পেলাম শুধু শিক্ষার নয়, নৈতিকতারও চূড়ান্ত অবক্ষয়! যা সমাজের ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দেয়। 'অর্থ' হয়ে ওঠে মূল নিয়ামক। নৈতিকতার মধ্যেই আসে 'লিঙ্গন্যায়'সহ অন্যান্য ন্যায়ের দিকগুলি। এখানে নিগৃহীতা একজন নারী। সে কারণে যে লিঙ্গন্যায় তাঁর স্বাভাবিক প্রাপ্য, তা তিনি পেলেনই না, উপরন্তু নির্মম, অমানুষিক অত্যাচার নেমে এল তাঁর উপর। তার দেহের বাইরের অংশে এবং ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অসংখ্য ক্ষত চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় এই সমাজে পশুর সংখ্যা কম নয়। শুধু পশু বললেও বোধহয় কম বলা হয়।

পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক এবং অত্যন্ত যত্নশীল এবং সেবাপরায়ন একজন চিকিৎসক, যিনি ঘটনার দিন - দিন এবং রাতে ডবল ডিউটি করছিলেন। তিনি রাতে বিশ্রামের জন্য কোনো বিশ্রাম কক্ষ পাননি; পাবেন কেমন করে? সেরকম কোনো ব্যবস্থাই তো ঐ হাসপাতালটিতে ছিল না। অথচ ঐ হাসপাতালটি শুধু একটি সরকারী হাসপাতালই নয়, একটি বহু পুরাতন ও খ্যাতিসম্পন্ন হাসপাতাল এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার একটি নামী কেন্দ্রও বটে। গভীর রাত্রে ঐ তরুণী বাধ্য হয়েই একটি সেমিনার কক্ষে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নেন। সেখানেই গভীর রাত্রে পৌঁছে গেল এক মদ্যপ সিভিক ভলান্টিয়ার ও হয়তো বা তার সঙ্গীরা!! এটা কীভাবে সম্ভব হল তা আমাদের জানা নেই। টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গেল তড়িঘড়ি পাশের ঘরটি ভাঙার নির্দেশও এসে গেল। ঐ চিকিৎসকের পিতামাতাকে যৎপরনাই বিভ্রান্ত করা হয় এবং তাঁরা অকুস্থলে এসে পৌঁছালে তাঁদের বাইরে অপেক্ষা করানো হল তিন ঘণ্টা এবং বাবা মায়ের কাতর আবেদনে কর্ণপাত না করে দেহ সৎকার করা হ'ল এবং তারও আগে সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে দেহের সুরতহাল হল, পিতামাতার বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

চিকিৎসকটির দেহের অবস্থা দেখে বা জেনে যাঁরা অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ, তাঁরা বলেছেন এতটা ক্ষতিসাধনে শুধু একজন দুষ্কৃতি নয়, অনেকজন দুষ্কৃতির জড়িত থাকাই সম্ভব ও স্বাভাবিক। হয়ত তাই। কিন্তু ঐ উল্লেখিত সিভিক ভলান্টিয়ার ছাড়া আর কারোকে তো ধরাই হয়নি। মৃতার পিতামাতা আদালতের দরজায় শুধু করাঘাতই করেননি, অনেক প্রশ্নও রেখেছিলেন ন্যায়ালয়ের সমীপে, তার উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। সর্বস্ব হারানোর ব্যথা বুকে চেপে ঐ নির্যাতিতার পিতামাতা লড়াই করে চলেছেন তাঁদের কন্যার জন্য 'ন্যায়' চেয়ে। এসবই ঘটছে আমার একদা প্রাণের শহর কলকাতায়।

এত হতাশার মধ্যে সবচেয়ে আশা ও আনন্দের বিষয় হল ন্যায় চেয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের লাগাতার আন্দোলন এবং তাতে সাধারণ নাগরিকদের অভূতপূর্ব সমর্থন ও অংশ গ্রহণ। এই আন্দোলনের শিখা এখনও অনির্বাণ। আমাদের তরুণ সমাজকে কুর্নিশ জানিয়ে বলতে চাইঃ "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো।"

Exploring the Wild Heart of Malaysian Borneo

K K Satapathy

Borneo is the third largest island in the world, situated in the extreme southwestern part of Pacific Ocean. The island is politically divided among three countries: Malesia and Brunei in the north, Indonesia in the south; about 73% of island is Indonesian territory. Borneo is primarily a mountainous region and home to world’s oldest tropical rain forest with countless flora and fauna, numerous ethnic tribes and spectacular landscapes. Being wild, tropical and remote, Borneo is Southeast Asia’s substitute to Amazon. Along the northwest coast and northern tip, lie Malaysian state of Sabah and Sarawak, which make up 26% of the island. Sarawak, the Malaysia’s largest state is home to 27 ethnic groups speaking 45 different languages and dialects with each group inhariting their unique beliefs, tradition and cultures. My seven-day trip to Sarawak state as a part of the group tour from Kolkata during June, 2024 was full of active adventure set in natural paradise. I actually knew very little about Borneo, so it was really exciting finding out more leading up visiting – and we learnt so much as long as we were there.

Island of Borneo

From Kolkata to Kuching

The journey to Kuching, the capital city Saraswat with brief halt in Kualaumpur by Air was very smooth. From the aircraft, Kuching looked like a very big city. Malaysian time is two and half hour ahead of India and we reached

Kuching at around 12-40 PM. The local guide arrived in a bus. We immediately boarded into the bus and later had lunch in a local restaurant. The Kuching city looked quite nice, neat and clean with large number of vehicles on the road. The guide gave an introduction about Kuching while in the bus. Kuching is the capital of Sarawak, the largest state of Malaysia. It is an autonomous state. That is why we had to take immigration twice, once in Kualalumpur and second time at Kuching. Even a Malaysian cannot enter here without immigration. Malaysians (outside Borneo) needs permit if he wishes to stay here more than 3 months. The state was under Brunei king up to 1841 before it came a under British. In 1941, it was occupied by Japan, later in 1946, it become a British colony. In 1963, it joined Malaysia as an autonomous state. Its king is one of the nine kings who rules Malaysia by turns. The majority population is Chinese followed by Malaysians. There are about 5000 Indians in the city, mostly professionals – doctors, engineers and lawyers etc.

A rural market in Borneo

Kuching Water front

After resting for some time in the designated hotel, we took a stroll to nearby Kuching river front, about one-kilometer long nice boulevard skirting Sarawak river's southern water front. Once a muddy stretch of a worn-out

Warehouses and wharves, large scale revitalization has transformed it into a vibrant recreation and entertainment zone housed with craft shops, cafes and food stalls serving Malaysian, Chinese and even Indian foods. There is a beautiful parliament building near the riverfront. From the waterfront, at stones throw, is the old bazar established by Cantonese immigrants in the 1820s where there are hundreds of shops dealing with almost everything alongside souvenir outlets, bars and eateries. We could buy authentic souvenirs from these shops. Kuching is a UNESCO listed foodie destination and the restored river bank is lined with food stalls to whet one's appetite. During the rainforest festival, many people from different countries flocks to the city.

Kuching water front

An encounter with orangutan

Next morning, we reached Semenggoh orangutan sanctuary, a 40-minute drive from Kuching. It is a natural reserve for rehabilitation of endangered orangutans. The center is home to semi- wild orangutans, many orphaned, injured and rescued from illegal captivity. The ranger's brieffed on the purpose of the center and the conservation objectives. The island is one of the two places in the world where one can see orangutans swinging on trees in the wild. They are not guerillas which are found in Africa. The most arboreal of the great apes have long hand, makes nest and spend most of their time in trees. Twice a day, the park ranger would call out during feeding time, the orangutans, swing down from the

reserve forest to receive supplemental food from them. We reached during morning feeding time (between 9-10 AM) and could observe 5-6 orangutans. The food, some banana and other fruits, were kept in a natural amphitheater at the fringe of the forest, where it was possible to observe orangutans coming down from the surrounding areas for the food provided. It was a mesmerizing experience.

Orangutans swinging down from the forest

Bidayuh village

Just half an hour drive from Semenggoh past pepper plantations, paddy fields and typical rain forest greenery, we reached Sarawak's most accessible 'long house'. About 80 families live within ironwood and bamboo walls of Anna Rai's village. We had to purchase ticket to enter. In Sarawak state, there are about 5000 villages, with families ranging from 10-2000 houses/families. The forest areas are owned by villagers on 60-100 year's lease. Shifting cultivation is prevalent in the area being rice as the main crop. We got acquainted with the tribes as they go about their daily activities, such as drying pepper, winnowing rice, weaving baskets etc. The main feature of the village is 'long houses. Long houses here are very big with a long corridor and many families live in one house. Until mid-19th century, the Bidayuhs were head hunters. Even killing enemies was associated with rituals for protection against misfortune etc. We visited one

‘head house’, where heads are still preserved as the skeletal symbol of their warrior past.

Head house containing skeletal remains in Bidayuh village

Boko national park

We visited Boko national park next day located at a short distance from South China Sea coast by riding a speed boat for about half hour. Boko national park is a natural geopark aspiring for UNESCO global geo park. Geopark is a region containing geological sites and landscapes of international and national interest, managed holistically based on the concept of preservation, education and sustainable development. Boko national park is also known for long nosed monkeys, dramatic rock formations and secluded rocks. The area of the park is 3112 m^2, most of which is covered with forest. Mangrove ecosystem also exists with roots sprouting from the soil for plant growth all around. We walked through thick jungles for about 600 hundred meters or so on the wooden platform created for pedestrians. Unfortunately, most of the animals were hiding, but we got lot of informations about the plants, insects etc. by the guide.

At the end of our walks, we arrived at the amazing sea beach, however no swimming was allowed as there could be crocodiles around.

Pedestrian's way inside Boko reserve forest

Batang Ai river cruise

The Batang Ai river cruise is a long tail boat trip in the river in Batang Ai national park to visit Iban tribe's 'long houses' and stay there two nights to learn firsthand knowledge about their rich cultural heritage and community life. Batang Ai national park was home to Sarawak's oldest Iban settlements and wild orangutan population. A hydro-electric project damned the Batang Ai river has created 24 square kilometer reservoir fed by four tributaries. The road trip to Batang Ai Lake from Kuching took approximately 4.5 hour (275kilometer) amid huge dense forests. We boarded in narrow power operated traditional canoe on the lake. The canoe was so narrow that only one person could sit crosswise and four persons in a row longitudinally. It was two-hour journey to our destination moving initially on the vast water body of reservoir and then turning to a shallow water tributary with fast flowing water. The dense rain forest on both sides of the river created an illusion of Amazon like situation. It was a risky journey as a number of times the boats capsizes and the boatman was thrown out; we had to get down and walk on shallow fast flowing water. Finally, we reached small Iban tribal settlement in Nanga Sumpa village inside the forest where a traditional long wooden house with asbestos roof was created for tourists in partnership with local people. For accommodation, we were provided with a room with western style

toilets, mosquito netting mattresses and bedding. There was no electricity and we had to manage with torchlight brought by us. Electricity, however was supplied from a generator for 3 hours at night. There were many foreign tourists staying in the lodge. The ingredients for food were brought by our tourist guide which was cooked there. The true attraction of this jungle shelter lies in its stunning riverside location and easy access to the surrounding rain forests.

Batang Ai river cruise

Ibans and their long houses

The Iban tribes migrated to the area in the middle of 16^{th} century and still maintaining their customs and traditions. They still follow shifting cultivation. Ibans were renowned for 'head hunting' and territorial migration and had a fearsome reputation as strong and successfully warring tribe. Since the arrival of Europeans and subsequent colonization of the area, headhunting gradually faded out of practice, although many other tribal customs and practices as well as Iban language continue to thrive. They traditionally live in 'long houses' often located along the river banks with long boats being main mode of people's transport. A '***long house***' is a wooden structure built on stilts. A '***long house'*** accommodates many families living together under one roof. A row of separate family rooms (with separate doors) sectioned off along with an open social area and meeting space is most prevelent. The more doors there are, the more the families and longer the house is.

An Iban long house

Inside the Iban village

The local guide took us for a walk through the Iban village located just across the river (joined by a small steel bridge). In the village, there are 44 families, of which 20 lives in the long house and 24 individual houses. Each house has a power-driven canoe. We met the headman (chief) on the common verandah of the long house where he lives. There were 20 doors on the verandah and one family lives behind each door. We had a peep into two doors and could see there were many more rooms longitudinally sufficient for family members. The headman provided us customary rice wine. There was elaborate ritual. The drink was to start by all at once. Those who do not drink have to touch the glass and then touch the lips by finger. We had long chatting and were able to experience the hosts culture, their way of life retaining their privacy and independence.

A jungle falls

Deep inside the reserve forest

Next morning, we took the same canoe boat and continued sailing upstream and stopped at a place to trek inside remote rain forest in looking for wild Orangutan under the guidance of a local but could not locate anyone. Sarawak's population of orangutan is estimated at 1,600, with 95% living in this Batang Ai forest. We sailed further upstream and eventually reached a jungle water fall where people could swim and enjoy the nibbling of their feet by fish. Near the fall, there was a space where a picnic was arranged by local youths. The specialty of this picnic was everything – rice, chicken etc, was prepared in green bamboo tubes in a bamboo structured oven, which was very tasty. After lunch we returned to the lodge. We returned to Kuching next day in very uncertain situation as the river was in spate following heavy down pour and it was a high risk to move in a canoe.

Cooking in bamboo tubes

As my journey came to an end, I felt a sense of awe and wonder. Borneo had captivated my heart with its raw beauty, its incredible biodiversity, and the warmth of its people. We returned to Kolkata as scheduled.

আত্মাধিকতার সন্ধানে - তীর্থরাজ অমরকণ্টক

সুধাংশু শেখর পাল

ছোটবেলায় স্কুলে পড়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অতি পরিচিত এক সংলাপের কথা উল্লেখ করে অমরকণ্টক দর্শনের আলেখ প্রস্তুত করতে চলেছি। সংলাপে দ্বিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ জয় করতে এসে কোন এক অবসর সময়ে সেনাপতি সেলুকাসকে সম্ভাষিত করে বললেন " সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ! “ ঐ বয়সে এর অন্তর্নিহিত অর্থ কতটা বোধগম্য হয়েছিল তা এখন বলতে পারব না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের পর চাকুরী সূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মস্থলে যোগদান এবং সময়ের সাথে সাথে সেইসব স্থানে একাত্ম হয়ে থাকার তাগিদে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারলাম, সত্যই ভারতবর্ষ বৈচিত্রময় অত্যাশ্চর্য এক দেশ। আসমুদ্র হিমালয় পরিবেষ্টিত এই উপমহাদেশে আছে ছোট বড় এবং স্বমহিমায় মহিমান্বিত পর্বতশৃঙ্খলা, জৈব বিবিধতায় ভরপুর অরণ্যানী, বৈচিত্রময় নয়নাভিরাম সুদীর্ঘ উপকূলরেখা (প্রায় 7520 কিমি দৈর্ঘ্য), অজস্র নদীবাহিত অববাহিকায় প্রাচীন তথা আধুনিক জনপদ সমূহ, বিস্তীর্ন শ্যামল শষ্যক্ষেত্র, অথবা যোজন বিস্তত বালুকাময় মরুভুমি--- এরই মধ্যস্থলে প্রাণের স্পন্দনে জাগরিত অনিন্দ্যসুন্দর মরুদ্যান। আছে বৈচিত্রময় জলাভূমি, হিমবাহ, বিগলিত কিম্বা বর্ষাপোষিত ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী, কখনো পূর্ণ যৌবনা, উচ্ছসিত নারীর মতো প্রাণবন্ত ; কখনো প্রাণঘাতী, দুঃখদায়িনী ভয়ংকরী, কখনো শীর্ণকায়া হয়ে প্রবহমান। এই উপমহাদেশে একাধারে আছে অত্যাধুনিক শহরসমূহ, অন্যত্র প্রত্যন্ত গ্রাম। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐতিহাসিক সৌধাবলী, প্রাচীন ও আধুনিক মন্দির ,অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি গগনস্পর্শী স্টেডিয়াম, ব্রিজ ও আরো কত কি! অনেক ভাষা, অনেক মতামত, নানা লোকাচার, নানা সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে ভাবতে পারা যায় না - কি বৈচিত্র্যময় পরিবেশ, আর সদর্থক অর্থে ভাবলে সত্যিই আমরা ভারতবাসীরা এক বৈচিত্র্যময় দেশে বাস করছি। জানিনা এক জন্মে এ সমস্ত বিবিধতার সম্ভার চাক্ষুষ অবলোকন ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকোণ থেকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে এই সন্দেহ নিরসন করতে বারবার বেরিয়ে পড়ি মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে দেখতে আর অনুসন্ধিৎসার মানসে নিজের জন্মভূমিকে নুতন করে চেনার ও জানার ইচ্ছায়।

এই উপলক্ষে সম্প্রতি অমরকন্টক দর্শনের অনুভূতি সুহৃদয় পাঠক বৃন্দের কাছে প্রস্তুত করছি। অমরকন্টক মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর জেলার অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে পৌরাণিক এক তীর্থনগরী। এই স্থানটির ভৌগোলিক পরিস্থিতি অনবদ্য - বিন্ধ্য, সাতপুরা ও মাইকল পর্বতশৃংখলার মিলনস্থল এবং সমুদ্রস্থল থেকে প্রায় ১০৫০ মি. উচ্চতায় অবস্থিত সুদৃশ্য শান্ত সমহিত এক মালভূমি। এই স্থান থেকে মা নর্মদা, শোন আর জাহিলা নদীত্রয়ের উৎপত্তি হয়েছে আর হিন্দুদের তীর্থস্থান গুলির মধ্যে অন্যতম। প্রায় ৪৭ বর্গ কিমি ব্যাপী শৈলনগরীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন পৌরাণিক মন্দির, গুহা, অসংখ্য ছোট বড় ঝর্ণা, প্রাচীন ও অধুনা তৈরি আশ্রম, ধর্মশালা,পর্যটক নিবাস ও হোটেল সমূহ, বিবিধতায় ভরপুর। আছে সুদৃশ্য বনস্পতি সম্ভার; লতা গুল্ম, সুগন্ধি পুষ্প ও ঔষধীয় বনরাজি। স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্যানির মধ্যে প্রবাহমান কোথাও মা নর্মদা, কোথাও শোন, ছোট-বড় ঝর্ণা ও নানা নামে জ্ঞাত এই সমস্ত নদীসমূহের বিভিন্ন উপধারা কখনো ভুপৃষ্ঠ থেকে প্রবাহমানা আবার কখনো শীর্ণকায়া, আবার কখনো অন্তঃসলিলা।

শহরের কোলাহল থেকে দূরে দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক শোভায় সুষমামন্ডিত অনবদ্য, শান্ত সমাহিত ধ্যানগম্ভীর প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাকে কতটা আকর্ষিত করেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার সামর্থ্য আমার নেই। বর্তমানে অমরকন্টক এর বিভিন্ন স্থানে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ হয়েছে। ক্ষণিকের জন্য যদি সময়যানে চড়ে অতীতে বিচরণ করা যায় তাহলে অনুমান করা যায়, কিসের আকর্ষণে সেই পৌরাণিক

কাল থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং মতাবলম্বী মুনি ঋষি, সাধু সন্ত ও ভক্ত জন এই স্থানে এসে ঐশ্বরিক চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন, আর অনেক ভাগ্যবান সাধক ক্লিষ্ট সাধন ও একাগ্রতার মাধ্যমে ঈশ্বর সাধনা করে জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধি করে অমরত্ব অর্জন করেছেন। সাধু-সন্তদের ধ্যানভুমি এই তীর্থক্ষেত্র কে তীর্থরাজ অমরকন্টক নামে অভিহিত করা হয়েছে। অমরকন্টক শব্দটি সংস্কৃত শব্দদ্বয় অমর (যার মৃত্যু নাই, immortal) এবং কন্টক বা কাঁটা সমভিব্যাহারে উৎপন্ন। মহাকবি কালিদাস ইহাকে অমরকুটা নামে অভিহিত করিয়াছেন, যা পরবর্তীকালে অমরকন্টক নামে প্রচলিত হয়েছে।

এহেন এক ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পর্যটনস্থল দর্শন করার সুপ্ত ইচ্ছা অনেকদিন থেকে ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি। অবশেষে গতবছরের (২০২৪) ডিসেম্বরের মাঝামাঝি(১৪ই ডিসেম্বর) সস্ত্রীক অমরকন্টক যাত্রার জন্য শালীমার রেল স্টেশন পৌঁছলাম । ট্রেন যোগে রাত ৮ ঘটিকায় যাত্রার নির্ধারিত সময় ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কোন কারনে যাত্রা 4 ঘন্টা বিলম্বে শুরু হল। পরবর্তী দিন অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় আমরা অমরকন্টক এর নিকটতম স্টেশন পেন্ড্রা পৌঁছলাম। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের বিপরীত দিকে বাসস্ট্যান্ডের দিকে পৌঁছলাম। এখান থেকে অমরকন্টক প্রায় ৪৭ কিলোমিটার দূরত্বে, যাবার জন্য বাস, ট্যাক্সি, বা অটো ব্যবস্থা আছে। আমরা একটা ক্যাব ভাড়া করলাম গন্তব্য স্থান অমরকন্টক এর উদ্দেশ্যে । গাড়ি স্টেশন পরিসর ছাড়িয়ে প্রথমে কয়েক কিমি সমতল ভূমিতে ছোট ছোট জনপদের মধ্য দিয়ে চলতে থাকলো। ৪-৫ কিমি চলার পর চড়াই পথ শুরু। ধীরে ধীরে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ শুরু। সমতল ভূমিতে, আম,জাম, কাঁঠাল ও সমতলভূমির চির পরিচিত গাছপালা, কৃষিজমি, জনপদ পিছনে ফেলে রাস্তায় দুই ধারে প্রথমে বনবিভাগ দ্বারা রোপিত পিপুল গাছের সারি ও তার পর যত উচ্চতা বাড়তে থাকল প্রাকৃতিক মূলত শাল, সেগুন ও অন্য বনস্পতির অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে অগ্রসর হতে থাকলাম। বিকাল হয়ে এসেছিল। জঙ্গলের মাঝে অস্তাচলগামী সূর্যের আর বনস্পতির আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে মনে মনে ছোটবেলার গ্রামে পড়ন্ত আলোকে লুকোচুরির কথা বার বার মনে পড়ছিল। মাঝে মাঝে পথপার্শ্বে কিছু কিছু জায়গায় মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের ছোট ছোট গ্রাম দেখছিলাম এবং গ্রামের সন্নিহিত সবুজ ক্ষেত, শীতের পরিচিত কিছু ফসলও দেখতে পেলাম।

এমন নয়, শাল সেগুনের জঙ্গল এই প্রথম দেখছি। এক নতুন পরিবেশ অন্য ভৌগোলিক সংস্থাপনা- যা অতি সাধারণ তা অতি দুর্লভ বলে মনে হতে লাগলো। এই শান্ত সমহিত পরিবেশের নিঃস্বর্গ শোভা অন্যরকম ---কেবলমাত্র অনুভবের বিষয়, ব্যক্তিগতও বলতে পারা যায় রাস্তার দু'ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকা রকমারি পাথরের চাঙ্গড় (Boulder), সন্ধ্যার প্রাক্কালে নীড়াভিমুখী পক্ষীকুলের কলতান মাঝেমাঝে জঙ্গলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। মাঝেমাঝে বিপরীত দিক থেকে আসা যানবাহনের হর্ণও এর সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। জঙ্গল ঘন হওয়ার সাথে সাথে রাস্তার দু'ধারে বেশ উঁচু কাঁটাতারের বেড়া, যাতে জংলি জানোয়ার হঠাৎ চলমান যানবাহনের সামনে না আসতে পারে। লাল মাটিতে শাল, সেগুন ও অন্য গাছপালার জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট বড় জলস্রোত, কোথাও বা জল ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগের তৈরি কৃত্রিম জল সঞ্চয় সংরচনার মাধ্যমে জল পড়া দেখতে দেখতে গাড়ি কখন এক বেশ উঁচু জায়গায় পৌছলো, গাছ-গাছালিতে থাকা অপূর্ব এক স্থান। সূর্য তখন ডুবু ডুবু, কিছু কিছু গাছের পাতায় আলো পড়ে চকচক করছে, সামনে উপরের পাহাড় থেকে জল পড়ার অপরূপ শব্দ; আলো-আঁধারের মধ্যে প্রকৃতির নীরবতা ভেদ করে প্রাণদায়িনী, চঞ্চলমতি প্রবাহমানা জীবনদায়িনী প্রাকৃতিক জলধারা। মনে হল মা ধরিত্রীর বক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছে শীতল অমৃত ধারা, সামনে অপলক নয়নে অপেক্ষমান পিপাসিত সন্তানগন পিপাসা নিবারণ করার জন্য। ড্রাইভার মহোদয় আমাদের জানালো এই জলপ্রপাত এর নাম দুর্গাধারা। এই জলপ্রপাত একটি উপরের পাহাড়ের বক্ষভেদ করে ৫০ ফুট উপর থেকে পড়ছে। রাস্তার ডানপাশে মা দুর্গার এক ছোট মন্দির। সামনে প্রবেশদ্বার পেরোলে বামপাশে মন্দির, সামনে রেলিং দেওয়া সিঁড়ি পেরুলে ঝরনা। ওপর থেকে নিচে এক বড় কুন্ডে পড়ে পুনরায় ভূগর্ভস্থ হয়ে নিচে চলে যাচ্ছে। আমরা সিড়ির উপরে অনেকটা উঠে উপযুক্ত স্থান থেকে কিছু ফটোগ্রাফি করে নিচে অপেক্ষমান গাড়িতে বসে পড়লাম। আমাদের যাত্রা পুনরায় শুরু হল। কিছুক্ষণ চলার পর রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে চা পান করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা পুনরায় পাহাড়ি চড়াই চড়তে থাকলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এলো আর দূর থেকে জঙ্গলের অন্ধকার ভেদ করে বৈদ্যুতিক আলোর দিশা দেখতে দেখতে সন্ধ্যে ছটার সময় আমরা

অমরকন্টক জনপদের পূর্বনির্ধারিত এক হোটেলের সামনে উপস্থিত হলাম। হোটেলটি মূল সড়কের লাগোয়া অতি সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অমরকন্টক এর মূল বাজারের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। হোটেলের রুমের জানলার মধ্যে দিয়ে দেখলে নিচে প্রায় ২০০ মিটার দূরত্বে নর্মদা মাতার মন্দিরের শ্বেতশুভ্র চূড়া দেখা যায়। হোটেলে প্রবেশ করে চেক- ইন পর্ব সমাধা করে নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশ করলাম। চেক-ইন এর সময় জানতে পারলাম খুব শীঘ্র নর্মদা মাতা মন্দিরের সন্ধ্যা আরতি শুরু হবে। সেজন্য কাল বিলম্ব না করে স্নান সেরে মন্দির দর্শন ও সন্ধ্যা আরতি দর্শনের জন্য হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

নর্মদা মাতা মন্দির, নর্মদা উদগম স্থল দর্শন, সন্ধ্যারতি :সন্ধ্যে ৭:৩০ ঘটিকায় আমরা পদব্রজে মা নর্মদা মন্দির তথা নর্মদা উদগম স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। হোটেল থেকে ঢালু পাকা রাস্তা ধরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুপ্রশস্ত রাস্তার দু'ধারে অজস্র পূজার সামগ্রী ও নানাপ্রকার উপঢৌকন দেবার সামগ্রী, ধর্মীয় পুস্তক, দেবদেবীর ছোট বড় মূর্তি, নানা আকারের নর্মদা শিবলিঙ্গের সাজানো পসরা দেখতে দেখতে মন্দিরের অতি প্রশস্ত ও সুউচ্চ অতি আকর্ষক শ্বেতশুভ্র প্রবেশ তোরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে পূজা সামগ্রী নিয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। মন্দির চত্বর সুবিশাল, চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত।মন্দির প্রাঙ্গণ উজ্জ্বল নিয়ন ও মার্কারি আলোতে উদ্ভাসিত। Off Season এবং শীতের সন্ধ্যা হওয়ায় পর্যটক বা ভক্তমন্ডলীর ভিড় খুব একটা ছিল না । আরতি ইতিমধ্যে আমরা পৌঁছানোর কিছু আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্যদের সঙ্গে মা নর্মদার স্তুতি গান ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে যোগদান করলাম। আরতিতে যোগদান করায় খুবই মানসিক শান্তি পেলাম। এরপর আমরা সিঁড়ি বেয়ে খুব সাবধানে নিচে একটি ছোট কুন্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম এবং কিছুক্ষণ পর কাঁচ দিয়ে ঘেরা এক ছোট কক্ষের দরজার সামনে উপস্থিত হলাম। কাঁচের দরজার মাথায় লাল সিন্দুর রঙে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা নর্মদা মন্দির । এই স্থানটিকে নর্মদার উদগম স্থল বলা হয়। প্রায় ৩মিX৩মি আকারে কুন্ডটি শ্বেত পাথরে বাঁধানো এবং চারিদিকে কাচের আবরণে ঘেরা সেজন্য উপর থেকে কুন্ডটির দর্শনে কোন অসুবিধা নাই। কথিত আছে মা নর্মদা সেই কোন এক পৌরাণিক কাল থেকে এখানে অন্তঃসলীলা হয়ে বিদ্যমান এবং এই কুন্ড থেকে জলধারার আকারে ধরিত্রীর উপরে প্রকট হন। এই নর্মদা কুন্ডের জলধারা ছোট একটি নলের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী বড় আকারের এক কুন্ডে জমা হচ্ছে। কুন্ডের চারপাশ শ্বেত পাথরের সিঁড়ি নির্মিত ও চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল সম্বলিত, কুন্ডের চারিদিকে প্রদক্ষিণের জন্য শ্বেত পাথরের তৈরি চওড়া পরিক্রমা করে সিড়িতে দাঁড়িয়ে কুন্ডের জলস্পর্শ বা এই পবিত্র জল পাত্রে ভরে নেওয়া যায়। মন্দির চত্বরে অনেক দেব দেবীর মন্দির ও আছে এর মধ্যে প্রমূখ নর্মদা মা, শিব ভগবান, কার্তিক, শ্রীরাম-জানকীর মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, শ্রী সূর্য নারায়ন মন্দির, দুর্গা মাতা অন্নপূর্ণা মন্দির, ভগ্নেশ্বর মহাদেব মন্দির, সিদ্ধেশ্বর মহাদেব মন্দির, রাধা কৃষ্ণ মন্দির এবং একাদশ রুদ্র মন্দির। সন্ধ্যা আরতির পর এই সমস্ত মন্দির দর্শন করে নর্মদা কুন্ড পরিক্রমা করলাম আর ভাবতে থাকলাম এই প্রাচীন মন্দির চত্বরে কত না চরণ চিহ্ন ছড়ানো এই স্থান ঘিরে। কত শত সাধু ও যোগীদের চরণ স্পর্শ ও সাধনার স্থল এই নর্মদাকুণ্ড বা নর্মদা মাতা মন্দির। সময়ের সাথে সাথে পুরনো মন্দির সংস্কার ও জীর্ণদ্বার হয়েছে। অতি সংক্ষেপে এর বিবরণ না দিলে ভ্রমণ বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সুহৃদয় পাঠকগণ আশা করি, ধৈর্য সহকারে এই বিষয়ে পাঠ করবেন।

এক পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী শিবের মানসকন্যা হলেন মা নর্মদা । ঘোর তপস্যারত ভগবান শিবের শ্বেদবিন্দু থেকে নর্মদা মার সৃষ্টি হয়েছে (শিবপুরাণ অনুযায়ী)। অন্য এক পৌরাণিক কথা অনুযায়ী মা নর্মদা হলেন স্বর্গের নদী মা গঙ্গার মাতা। অমরকন্টক এর জঙ্গলের বসবাসকারী রেবা নায়ক নামে এক আদিবাসী ব্যক্তিকে স্বপ্নে দর্শন দেন যে তিনি অমরকন্টক এর এক কুণ্ডে অবস্থান করছেন। তিনি ঘন জঙ্গলে ঢাকা এই স্থানটি পরিষ্কার করে এই স্থানে মা নর্মদার এক মূর্তি স্থাপন করেন এবং এখান থেকে নর্মদা প্রবাহ জনসমক্ষে আসে। ঐতিহাসিক দস্তাবেজ অনুযায়ী নর্মদা উদগম স্থলে বর্তমান মন্দিরের জায়গায় কালচরি রাজবংশের রাজা এই মন্দির স্থাপন করেন খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। এর অনেক বর্ষ পরে নাগপুরের এক রাজা এই মন্দিরের পুনঃনির্মাণ করেন। পরে মহারানী দেবী অহল্যাবাই এই মন্দিরের পুনঃনির্মাণ করে মন্দিরে অন্য দেব দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জগৎ গুরু আদি শঙ্করাচার্য মা নর্মদার উৎস সন্ধানে

বেরিয়ে এই স্থানে তপস্যা করেন এবং আবিষ্কার করেন যে শ্রাবণ মাসে এই মন্দিরের কিছু নিচে অবস্থিত স্বয়ম্ভূ পাতালেশ্বর শিবলিঙ্গের উপর মা নর্মদার ভক্তিপূর্ণ জলাভিষেক আপনাআপনি হয়। এটা ভক্তদের কাছে এক অলৌকিক ঘটনা এবং অন্যদের কাছে এক প্রাকৃতিক ঘটনা বা স্থান মাহাত্ম্য। আদি শঙ্করাচার্য এখানে পঞ্চরথের আকারে নর্মদার মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে নর্মদা কুন্ডে মা নর্মদা মকর (কুমির) বাহিনী আর কষ্টিপাথর তৈরি অপূর্ব মূর্তির চক্ষু যুগলে রয়েছে মহামূল্য মণি।

সন্ধ্যা আরতি ও মন্দির দর্শন করে এক অপার আনন্দ অনুভব করলাম। আর মন্দির চত্বরে বসে ভাবতে থাকলাম দৈনন্দিন রুটিন জীবনের বাহিরে যে জীবন সে জীবন নিয়ে কিছু সময় কাটানো মানুষের প্রয়োজন। অবশ্য এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। যা হোক অমরকন্টক দর্শনের প্রথম দিন মা নর্মদা উৎগম স্থল ও নর্মদা মন্দির দর্শনের অবর্ণনীয় অনুভূতি নিয়ে পদব্রজে হোটেলের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত মন্দির শিখরের অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে হোটেলে পৌঁছলাম এবং সেখানে নৈশ ভোজ সমাপ্ত করে শয়ন করলাম। আর সারাদিনের অমরকন্টক দর্শনের দৃশ্যাবলী মনে করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানিনা।

ডিসেম্বর 16 (দ্বিতীয় দিন): পরদিন সকালে উঠে প্রাতকৃত্য, স্নান ও প্রাতরাশ সমাপ্ত করে অমরকন্টক এর বাকি প্রমূখ দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্য একটা ভাড়ার গাড়ি ঠিক করলাম। সকাল ৯ ঘটিকায় আমাদের যাত্রা শুরু হল। হোটেল তথা নর্মদা মাতা মন্দির থেকে প্রায় ১.৫ কিমি দূরে মাইকল পর্বতশৃঙ্খলার এক প্রান্তে অবস্থিত শোন উদগম স্থলে পৌঁছলাম। পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্রস্থল থেকে প্রায় 1065 মিটার, চারিদিকে সুউচ্চ পাইনের জঙ্গল। মাঝে মাঝে শাল ও অন্য সরলবর্গীয় পত্রমোচি বা অর্ধ-পত্র মোচি বৃক্ষরাজির সারি। পাহাড়ের উপর পড়ে থাকা পাতার মধ্য দিয়ে বহে যাওয়া শনশন হাওয়া। সকালের শীতের ঠান্ডা হাওয়া, বনের ছায়ায় মাঝেমাঝে সকালের উজ্জ্বল সূর্যালোকে উদ্ভাসিত জঙ্গলের স্থান বিশেষ বারবার গাড়ির গতিপথের সঙ্গে রূপ বদলাচ্ছিল। কখনো কখনো দূরে পাহাড়ের মাথা থেকে প্রবাহমান শোন নদীকে দেখা যাচ্ছিল। এইভাবে দেড় কিমি রাস্তার অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে আমরা শোন উদগম স্থলের উপরে রাস্তার এক প্রান্তে পৌঁছে গাড়ি পার্কিং করা হলো। এখান থেকে পায়ে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে প্রায় 50 মিটার নিচে একটা প্রাচীন মন্দির চত্বরে পৌঁছলাম। এই মন্দিরের পিছন থেকে প্রায় 100 মিটার উপর থেকে এক জলপ্রপাত দেখলাম। এই জলপ্রপাতের জলধারা নিচে পড়ে অন্তঃসলিলা হয়ে এক বৃষ মুখ আকৃতি পাথরের মধ্য দিয়ে নিচে প্রবাহিত হচ্ছে। এটাই শোন নদীর উদগম স্থল। এই স্থানকে শোনমুদ্রা ও বলা হয়।পবিত্র নদীর জলধারা মাথায় ছিটিয়ে, চারিপাশে মন্দিরের দেবদেবী দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করলাম। শোন উদগম স্থল থেকে সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। দর্শন সমাপ্ত করে এই স্থানের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা ক্যামেরা বন্দী করে পুনরায় সিঁড়ি বেয়ে উপরে পার্কিং স্থলে পৌঁছে গাড়িতে বসলাম। এবার আমাদের গাড়ি পাহাড়ের রাস্তা ধরে অন্য দর্শনীয় স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

কপিল ধারা ও দুধধারা জলপ্রপাত: এরপর আমরা অমরকন্টক এর দুইটি বিখ্যাত জলপ্রপাত দেখার জন্য রওনা হলাম। শোনমুদ্রা থেকে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় 3 কিমি। কিছু পাহাড়ি কিছু সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে (পাকা রাস্তা) গাড়ি চলার পরে কপিলধারার কাছাকাছি এক পার্কিং স্থলে গাড়ি রাখা হলো। সামনে চেক গেট পার হয়ে পায়ে হেঁটে কিছুটা অগ্রসর হলে এক সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার। প্রায় দেড় কিমি হাঁটার পথ পেরিয়ে চললে প্রথমে পড়ে কপিলধারা। মূল প্রবেশদ্বারের পরে শুরু হয়েছে চওড়া পাকা রাস্তা। রাস্তার দুই ধারে আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের সারি, আর তার পেছনে রয়েছে পাইন গাছের জঙ্গল। কোথাও কোথাও বিভিন্ন প্রজাতির বড় মোটা-মোটা বাঁশের জঙ্গল। প্রায় ৫০০ মিটার পথ পায়ে চলার পর একটা কাঠের ছোট সেতু পার হলাম। রাস্তার ডান পাশ দিয়ে প্রবাহিত নর্মদার এক ছোট শাখা নদীর উপর নির্মিত। কিছুটা প্রবাহিত হবার পর নর্মদা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ।কাঠের সেতু পেরিয়ে আমরা পাহাড়ি বন্ধুর পথ ধরে কপিলধারার দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। নর্মদা নদীর সবচেয়ে বড় মনোরম জলপ্রপাতের দিকে ক্রমাগত নিচে নামতে থাকলাম। উঁচু নিচু রাস্তায় বড় বড় পাথরের চাঙড় । সাবধানে পা ফেলতে হয়, চতুর্দিকে ঘন জঙ্গল, আর খুব বেশি ঢালদার পাহাড়। নাম না জানা লতাগুল্ম, জংলি ফুল, ঔষধীয় উদ্ভিদের অপরূপ সমারোহে সজ্জিত পাহাড়ি রাস্তা পার হয়ে জলপ্রপাত যেখানে পড়ছে তার থেকে প্রায় ৫০০ মি দূরে আমরা উপস্থিত হলাম। মনের আনন্দে এই জলপ্রপাতের প্রাকৃতিক

শোভা ও নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে কখন যে পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। অনেকটা নিচে এসেছি বলে এখানে বেশ ঠান্ডা লাগছিল। পর্যটকদের উল্লাসধ্বনি, জলপ্রপাতের শব্দ, জঙ্গলের হাওয়ার শনশনানি, গাছের পাতায় আলোর লুকোচুরি আর প্রকৃতির ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ দেখতে দেখতে ক্ষণিকের জন্য বাকহীন হয়ে পড়লাম। আর এই অপূর্ব দৃশ্যের কিছু ফটোগ্রাফি করলাম। এই জলপ্রপাত নর্মদার মূল জলধারা, প্রায় 50 মিটার উপর থেকে নিচে পড়ে সামনে এগিয়ে চলেছে জলধারা।পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে মহর্ষি কপিল নর্মদা নদীর তীরে এই নির্জন ও মনোরম স্থলে কঠোর তপস্যা করেন। সেজন্য এই জলপ্রপাতের নাম কপিল ধারা।

কপিলধারা দর্শন করার পর ডানদিকে ঘুরে আরো দেড় কিমি পায়ে হেঁটে যাত্রা করলে দেখা মিলবে দুধধারা।পথ আরো দুর্গম এবং আগের থেকে সংকীর্ণ।পথে পড়ে আছে পাথরের বড় বড় পিচ্ছিল চাঙড় । আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী ও কপিলধারা পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু দুধধারা যাবার রাস্তা ওর পক্ষে সুবিধাজনক নয় বলে শ্রীমতিকে পথিপার্শে এক বিশ্রামস্থলে অপেক্ষা করতে বললাম। আমি একাই পাহাড়ি পথ দিয়ে ধীরে ধীরে দুধধারার দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। বাঁদিকে বয়ে চলেছে কপিলধারা জলপ্রপাতের থেকে পতিত নর্মদার জলধারা । নদীগর্ভে ছোট-বড় উপ্পল খন্ড। তারই মধ্য দিয়ে স্বচ্ছ সলিলা মা নর্মদার স্রোত । নদী-গর্ভের বালুকণাও দৃশ্যমান। বাঁদিকে নদীর স্রোত বয়ে চলেছে । স্রোতের ডান দিকটা কংক্রিটের বাধানো। পাশে ডানদিক বরাবর পায়ে চলার রাস্তা। চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমরা নর্মদার দ্বিতীয় জলপ্রপাত দুধধারায় পৌঁছে গেলাম। এখানে জলপ্রপাতের দু'ধারে কংক্রিটের দেওয়াল, মাঝখান দিয়ে বহে চলেছে স্বচ্ছসলিলা চঞ্চলা মা নর্মদা। দুধধারায় নর্মদার গতিপথের প্রায় ১০ মি উপর থেকে জলধারা এত বেগে বইছে যে ধারার রংটা দুধের মতো সাদা লাগছে ।এই কারণে এই জলপ্রপাতকে দুধধারা বলা হয়। কিছু দূর যাবার পর জলধারার গতিপথ স্বাভাবিক হয়ে যায়। দেখলাম এখানে অনেকে নর্মদার পবিত্র জলে স্নান করছেন। এখানে রাস্তার ডান দিকে একটা প্রাচীন গুহা আছে ।এই গুহায় অতীতে নাকি সাধু সন্তরা থাকতেন। দুধধারা দর্শন ও ফটোগ্রাফির পর আমি পুনরায় পাহাড় চড়ে যেখানে আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছেন সেখানে ফিরে গেলাম ও দুজনে একই পথ বেয়ে কপিলধারা-দুধধারা দর্শনের মূল প্রবেশদ্বার পেরিয়ে পার্কিংস্থল থেকে গাড়িতে বসে পড়লাম। সকাল থেকে পাহাড়ি রাস্তায় উপর নিচে পদযাত্রা করে বেশ খিদে পেয়েছিল। সেজন্য কিছুক্ষণ যাত্রা করার পর পথিপাশে এক সুরম্য রেস্টুরেন্টে মধ্যাহ্নভোজ সমাপ্ত করে খুন্নি নিবারণ ও যাত্রার ক্লান্তি কিছুটা লাঘব করলাম।

জৈন মন্দির : এরপর আমরা প্রায় ৩০ মিনিট চলার পর জৈন মন্দির পৌঁছলাম। অধুনা স্থাপিত এই মন্দিরটি ভগবান মহাবীর জৈনের উদ্দেশ্যে বিগত কুড়ি বছর ধরে তৈরি হচ্ছে। মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ হতে আরও কয়েক বছর লাগবে। প্রবেশদ্বার পেরিয়ে মন্দিরের সামনে রাজস্থানের চিতরের বিজয়স্তম্ভের অনুকরণে তৈরি সুউচ্চ বিজয়স্তম্ভ। এর ভিতরের কক্ষে মহাবীর জৈনের ছোট ছোট মূর্তি রাখা আছে। সম্পূর্ণ স্তম্ভটি বালু পাথরের কারুকার্য খচিত আর দূর থেকে অপূর্ব লাগছিল। এই বিজয়স্তম্ভ পার হয়ে প্রায় ২০ মিটার এগিয়ে গেলে সম্পূর্ণ রাজস্থানী শৈলীতে তৈরি মূল মন্দির। মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে অপূর্ব কারুকার্য। মন্দির গর্ভগৃহে সুউচ্চ বেদীর উপর অষ্টধাতু নির্মিত ভগবান মহাবীরের সুবিশাল মূর্তি। পদ্মাসনে বসা, নির্মিলিত নয়নে ধ্যানমগ্ন ভগবানকে দর্শন করে মন্দিরের ভিতর ও বাহিরে নয়নাভিরাম মূর্তির অনন্য কারুকার্য দেখতে দেখতে মন ক্ষণিকের জন্য অতীতের গৌরবমণ্ডিত ভারতবর্ষের দিকে চলে গেল। কি বিপুল বৈভব, শিল্পবোধ, একাত্মতা, কার্যকুশলতা ও কারিগরি জ্ঞান থাকলে এইরকম বিশাল বিশাল কালজয়ী মন্দির তৈরি করা যায়। অপূর্ব, শুধু অপূর্ব বললে সঠিক মূল্যায়ন করা হবে না। দর্শন সমাপ্ত করে আমরা পুনরায় একটি প্রাচীন মন্দিরের সামনে এসে পড়লাম।

ত্রিমুখী মন্দির : সূর্য গড়িয়ে বিকাল হয়েছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পড়ন্ত বেলায় পাহাড়ে শীত বেশ উপভোগ্য লাগছিল। আমরা এখন ত্রিমুখী মন্দিরের প্রাঙ্গণে, প্রবেশদ্বারের সামনে। কালচরি রাজবংশের রাজা কর্ণদেব মহাচন্দ্রের দ্বারা খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে এক পাহাড়ের উপর তৈরি করা হয়েছিল । এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারের চূড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের মুখমণ্ডলের অপূর্ব তাম্রবর্ণের মূর্তি আছে। মন্দিরটি বর্তমানে সংস্কারাধীন। শুধু বাহির থেকে প্রবেশদ্বার পর্যটকদের দর্শনের জন্য বর্তমানে অনুমোদিত। মন্দির ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণের অধীনে আছে। মন্দিরটির স্থাপত্য শৈলী নাগরা, দ্রাবিড় ও কলিঙ্গ শৈলির অপূর্ব সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছিল। ভিতরে মন্দির পুনঃনির্মাণ/

পুনঃজিবিকরণের কাজ চলছে এবং প্রবেশদ্বার দর্শন ব্যতীত অন্যত্র যাওয়া নিষেধ থাকায় আমরা মন্দিরের সামনে কয়েকটা ফটোগ্রাফ নিয়ে অন্য দর্শনীয় স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

কবির চবুতরা: এবার আমরা এসে পৌঁছলাম অমরকন্টক এর অন্যতম বৈশিষ্ট্যময় এক দর্শনীয় স্থল মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিশগড় জেলার সীমান্তে গভীর অরন্যানীর মধ্যস্থলে শান্ত সমাহিত, ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে সন্ত কবিরের ধ্যানভুমি। ইহাকে কবির চবুতরা বলা হয় ।গাড়ি প্রায় কবির চবুতরার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছল । এরপরে সিমেন্টের তৈরি রাস্তা, ধাপে ধাপে কংক্রিটের তৈরি সিঁড়ি ও চাতাল পেরিয়ে গেলে কয়েকটি ছোট বড় কক্ষ দেখতে পাওয়া যাবে। এগুলি প্রার্থনা গৃহ, সংগীত ভবন ও যাত্রীদের বিশ্রাম বা বসার ঘর । এগুলি পার করলে ডানদিকে এগিয়ে গেলে দেখা মিলবে ছোট-বড় কুণ্ড আর এই সমস্ত কুণ্ড থেকে ভূমিগত জল ধারা নির্গত হচ্ছে। এখানে পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে যাতায়াতের সংকীর্ণ রাস্তা করা হয়েছে । রাস্তার দু'ধারে মৌসুমী ফুলের গাছ লাগানো আছে ।সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ডানদিকে আরও অগ্রসর হলে দেখা মিলবে এক প্রাকৃতিক ক্ষীণ জলধারা আর ডানদিকে বিশাল বটবৃক্ষ যার চতুর্দিক থেকে অসংখ্য ঝুরি নেমেছে ।এই গাছের তলদেশ পাথর ও সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো ।সন্ত কবির এই বট বৃক্ষের তলদেশে বসে দীর্ঘদিন সাধন ভজন করেন ।এই বট বৃক্ষের চতুর্দিকে রয়েছে শাল, সেগুন, আম, কাঁঠাল, রকমারি লতাগুল্ম ও বনস্পতির গভীর জঙ্গল । আছে আশ্চর্য নীরবতা আর প্রকৃতির ধ্যান গম্ভীর রূপ আছে নিজেকে জানার আর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার উপযুক্ত পরিবেশ ।

মা কি বাগিচা: চলতে চলতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে উঠেছিল, ঠান্ডা হাওয়া বইছিল বাহিরে। গাড়ি এসে পৌঁছল রাস্তার নিচে মা কি বাগিচার সামনে । পাহাড় কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। রাস্তা থেকে প্রায় ৩০ মিটার নিচে নামলে এসে পড়লাম মা কি বাগিচায় । নিচে বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে আট চালার আদলে তৈরি করা হয়েছে একটা পূজাস্থল বা হলঘর । এই হলঘরের একদিকে নর্মদা মাতার মন্দির । অতি সাদামাটা। ছোট ছোট মন্দির প্রকোষ্ঠে অন্য দেব দেবীর মূর্তি বসানো হয়েছে। বাহিরের পরিবেশে সন্ধ্যের আলো আঁধারের মায়াজাল, সাথে কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলো, চারিদিকে দণ্ডায়মান সরলবর্গীয় মূলত শাল, সেগুনের বৃক্ষরাজি, নিচে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে বয়ে চলেছে মা নর্মদা, সন্ধ্যা আরতির ঘন্টাধ্বনি, ধুপ, ধুনা ও অগুরু আদি সামগ্রী প্রজ্জলনের অপূর্ব সুগন্ধ - সব মিলিয়ে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ! পৌরাণিক গাঁথা অনুযায়ী এই স্থানে মা নর্মদা বাল্যকালের সখীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন। এর জন্য এর নাম "মা কি বাগিচা" । সত্যই চিত্ত বিনোদন আর সাথে সাথে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন করার অতি অপরূপ ও মনোরম স্থান বলে মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম আরো কিছুক্ষণ সময় কাটাই। কিন্তু বাদ সাধলো চালকের মোবাইলের ডাক। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ায় এই অপূর্ব পরিবেশকে পিছনে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে পুনরায় গাড়িতে বসলাম এবং অল্প কিছুক্ষণ চলার পর আমরা হোটেলে রাত্রি বাসের জন্য পৌছালাম। এইভাবে আমরা অমরকন্টক দর্শনের দ্বিতীয় দিন ব্যতীত করলাম।

জলেশ্বর ধাম ও অমরেশ্বর মন্দির: (তৃতীয় দিন): সকালে স্নান ও নিত্যকর্ম সমাধা করে আমরা নর্মদা মন্দির তথা যে হোটেলে আমরা অমরকন্টকে ছিলাম, সেখান থেকে প্রায় উত্তর-পূর্ব দিকে ৮ কিমি দূরে প্রকৃতির কোলে এক নিভৃত অথচ মনোরম পরিবেশে জলেশ্বর ধামে পৌঁছলাম । এখানে মহাদেবের একটি মন্দির আছে । এই পবিত্র মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে মহাদেব স্বয়ম্ভূ। এখানে শিবলিঙ্গটি স্বয়ং মহাদেব দ্বারা স্থাপিত বলে পুরান কথায় উল্লেখ আছে । পৌরাণিক আখ্যানুসার বাণাসুর শিবের পরম ভক্ত ছিলেন । কঠোর তপস্যা করে বর প্রাপ্ত হন । পরে তপস্যা করে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা দেবের কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হন । এই ত্রিদেবের কৃপায় অতি বলশালী ও অপরাজেয় হয়ে দেবতাদের উপর অত্যাচার শুরু করেন । ইহাতে শিব ভগবান বাণাসুরের ওপর রুষ্ট হয়ে পিনাক ধনু দ্বারা বাণাসুরকে প্রহার করেন। চতুর বাণাসুর আরাধ্য শিবলিঙ্গ নিজ মস্তকে ধারণ করেন। কিন্তু বাণাঘাতে শিবলিঙ্গ তিন টুকরো হয়ে নর্মদা নদীর জলে পতিত হয়। আর এই জল থেকে জলেশ্বর মহাদেব প্রকট হয়। এই স্থানের নাম জলেস্বর ধাম। এখানে শিব স্বয়ম্ভূ।ভগবান শিবের বাণাঘাতে লিঙ্গের অংশবিশেষ এখানে প্রকটমান এবং এই লিঙ্গকে বাণী লিঙ্গ বলা হয় । প্রত্যেক বৎসর কাবড় যাত্রার সময় এই মন্দিরে অসংখ্য ভক্ত সমাবেশ হয়।মন্দিরের শিবলিঙ্গ দর্শন, পূজাদি করার পর আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম এবং মন্দির থেকে বেরিয়ে ডান দিকে আরো প্রায় দেড় কিমি সমতল রাস্তায় চলার পর আরো এক প্রসিদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। এই মন্দিরের নাম অমরেশ্বর মহাদেব মন্দির । বিশাল প্রবেশদ্বার পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ

করার আগে ঠিক সম্মুখে ভগবান শিবের বাহন ভৃঙ্গির গ্রানাইট পাথরের তৈরি বিশাল মূর্তি স্থাপিত।মন্দিরের ভিতরে ১১ ফুট উঁচু ও ৫১ টন ওজনের গ্রানাইট পাথরের তৈরি বিশাল শিবলিঙ্গ স্থাপিত। এই শিবলিঙ্গে অভিষেকের জন্য পিছন দিক থেকে একটা সিড়ির ব্যবস্থা করা আছে। পৌরাণিক গাথা অনুসারে দেবমাতা অদিতি নিজ সন্তানদের সুরক্ষার জন্য এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরের সংস্কার করা হয়। এই মন্দিরে দ্বাদশ শিবলিঙ্গেরও প্রতিষ্ঠা করা আছে ।এই মন্দিরটি অমরকন্টকের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত, যার জন্য এর বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। শিবরাত্রি, কাবড় যাত্রা ইত্যাদির সময় এখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। শিবলিঙ্গের জলাভিষেক,পূজা ইত্যাদি করার পর আমরা হোটেলে ফেরার জন্য গাড়িতে বসলাম। পথিপাশের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে আমরা ধীরে ধীরে হোটেলের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। রাস্তার ধারে এবং আমাদের গন্তব্যস্থান হোটেলে পৌঁছবার আগে অতি সুন্দর এবং দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীতে তৈরি এক অপূর্ব আশ্রম। যার নাম কল্যাণ আশ্রম এবং এর কাছাকাছি প্রায় ৫০০ মি ব্যবধানে আরো একটি আশ্রম, মৃত্যুঞ্জয় আশ্রম দেখলাম । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ফুল বাগিচায় সুশোভিত এই সমস্ত আশ্রমে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি আছে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় পূজা অর্চনা ও প্রার্থনার জন্য ভক্ত ও পর্যটকদের কাছে অবারিত দ্বার।

প্রাচীন কালচেরি মন্দির: এরপর গাড়ি এসে পৌছুলো কালচেরি রাজাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন কালচেরি মন্দিরের প্রবেশদ্বারে। মন্দির চত্বর নর্মদা কুন্ডের দক্ষিণ দিকে প্রায় এক কিমি দূরে অবস্থিত এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এই মন্দির 1042-73 AD তে মহারাজা কর্ণদেব দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দির চত্বরে একাধিক ছোট-বড় মন্দির আছে। এর মধ্যে মাচেন্দ্রনাথ এবং পাতালেশ্বর শিবের মন্দির স্থাপত্য কলার দিক থেকে অতি উৎকৃষ্ট। এখানে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাগপুরের ভোসলে রাজার তৈরি কেশব নারায়ন মন্দিরও আছে । যদ্যপি মন্দিরগুলি ভগ্নপ্রায় তথাপি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ যে সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করছে তা প্রশংসার যোগ্য। বিস্তীর্ণ পরিসরে এই সমস্ত প্রাচীন মন্দিরসমূহ ইতিহাসের কত না ঘটনার সাক্ষী! আর নানা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে এখনো দন্ডায়মান আর অগণিত দর্শক মন্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে তা ভাবলে অবাক লাগে। এই সমস্ত মন্দির গুলিতে দেব দেবীর মূর্তি থাকলেও অমরকন্টক এর অন্য মন্দির গুলির মতো পূজা পাঠের ব্যবস্থা তেমন একটা নেই বলে মনে হল। অনলাইনে টিকিট কেটে নিয়ে সস্ত্রীক মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। মন্দির প্রাঙ্গণের ভূ-দৃশ্য (landscape) অতি সুন্দর পুষ্প-বৃক্ষাদি ও কৃত্রিম বাগ বাগিচায় সুশোভিত। এখানে ছয়টি মন্দির ও মধ্যস্থলে সুরজকুন্ড নামে একটা কুণ্ড আছে। এই ছয়টা মন্দিরের মধ্যে কর্ণমন্দির, কেশব নারায়ণ মন্দির, মাচেন্দ্রনাথ মন্দির এবং পাতালেশ্বর মন্দিরগুলি কালচেরি রাজন্যবর্গের দ্বারা তৈরি হয়েছিল আর পরবর্তী কালে পঞ্চম এবং জোহিলা মন্দির অন্য রাজাদের দ্বারা তৈরি।

এই সমস্ত মন্দিরগুলির মধ্যে রাজা লক্ষীকর্ণ(1041- 1073CE) দ্বারা স্থাপিত কর্ণমন্দির, ত্রিমুখী মন্দির নামে সর্বজন বিদিত ও প্রমূখ মন্দিরের শিখরের স্থাপত্য কলা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উঁচু বেদির ওপর স্থাপিত মন্দিরে ব্রহ্মা,বিষ্ণু ও মহাদেবের মূর্তি বিরাজমান।মাচেন্দ্রনাথ মন্দির ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে সমর্পিত । মন্দিরের তিনটি অংশ মণ্ডপ গর্ভগৃহ সদর দালান ও প্রবেশদ্বার। মন্ডপটি পাথরের স্তম্ভের উপর স্থাপিত আর সামনের দিক ব্যতীত অন্য তিন দিক পাথরের দেওয়ালে আবৃত। সুরম্য সদর দালানের চূড়ায় সিংহের মূর্তি আছে ।গর্ভগৃহ পঞ্চরথের আকারে তৈরি এবং এর মধ্যে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। গর্ভগৃহের শিখর নাগরা স্থাপত্য শৈলীতে তৈরি এবং কলস আকৃতি।

পাতালেশ্বর মন্দিরও গর্ভগৃহ, সদর দালান ও প্রবেশদ্বারের সমন্বয়ে তৈরি। কথিত আছে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্য এই মন্দির ভ্রমণকালে একটি শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন।যদ্যপি এই মন্দিরের মূল প্রতিষ্ঠাতা কালচেরি রাজবংশের রাজা লক্ষীকর্ণ । মণ্ডপের উপরের অংশ পিরামিড আকৃতির আর গর্ভগৃহ পঞ্চরথের আকৃতির। মণ্ডপের তুলনায় গর্ভগৃহ ১.৪ মিটার নিচে আর এর জন্য এই মন্দিরের নাম পাতালেশ্বর মন্দির।

কেশব নারায়ণ মন্দির নাগপুরের ভোসলে রাজাদের দ্বারা খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরি। এই মন্দিরের বিশেষত্ব হলো যে দুটি কাঠামোর মধ্যে সমন্বয়কারী একই সদর দালান দ্বারা যুক্ত দুটি মন্দির প্রকোষ্ঠ/ কাঠামো একে অপরের সঙ্গে লম্বালম্বি ভাবে যুক্ত একটি পূর্বমুখী অন্যটা উত্তরমুখী বর্তমানে এগুলিতে কোন মূর্তি নাই। মন্দিরের চূড়া নাগরা স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন।

পঞ্চমঠ: উঁচু বেদির উপর তৈরি বিভিন্ন স্থাপত্য কলায় অপূর্ব নিদর্শনে তৈরি মন্দির সমূহ মন্দিরগুলি খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে গন্ড রাজাদের দ্বারা নির্মিত। শিখর দেশ নাগরা স্থাপত্য শৈলীর পরিচয় বহন করে। এখানে জোহিলা মন্দির পূর্ব বর্ণিত প্রাচীন মন্দির গুলির মধ্যে নবীনতম এবং স্থানীয় আদিবাসী প্রধান এর দ্বারা তৈরি মন্দিরটি অন্য মন্দির গুলির মতো উঁচু বেদীর উপর স্থাপিত এবং শিখর দেশ পিরামিড আকারের তৈরি এবং পিরামিডের দেয়াল গুলি অপূর্ব কারুকার্যমন্ডিত। কথিত আছে এখানে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্য মা নর্মদার উপস্থিতির সাক্ষ্য রাখতে সুরজকুন্ড নামে এক কুণ্ডের (জলাশয়) রচনা করেন।

মন্দির দুটি দর্শন করার পর অপরাহ্নে আমরা হোটেলে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হোটেলে চেক-আউট করার পর পেন্ড্রা স্টেশন পৌঁছানোর জন্য আগে থেকে ভাড়া করা গাড়িতে মালপত্র নিয়ে রওনা দিলাম। সেখান থেকে প্রথমে ট্রেনযোগে জব্বলপুর।পরে জব্বলপুর ভ্রমণ শেষ করে মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে আয়োজিত বান্ধবগড় সাফারি সমাপ্ত করে জব্বলপুর ফিরে এলাম (দু দিন এক রাত) এবং তেইশে ডিসেম্বর জব্বলপুর থেকে ট্রেনযোগে হাওড়া হয়ে কলকাতা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলাম।।

বিঃ দ্রঃ *:বিভিন্ন ধর্মীয় পর্যটক স্থল সম্বন্ধে যে সমস্ত পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর অবতারণা এই ভ্রমণ কাহিনীতে করা হয়েছে সে সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য ও থাকতে পারে বা আছে কিন্তু যাহা সর্বাধিক প্রচলিত বা আমার নিকট উপযুক্ত মনে হয়েছে তার উল্লেখ করলাম।*

প্রাচীন কালচেরি মন্দির

ত্রিদেব মন্দির

মা কি বাগিচা

জৈন মন্দির

নর্মদা মাতা মন্দির

নর্মদা উদগম স্থল

দুর্গাধারা

দুধধারা

বিষ্ণুপুর...... ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির

মৃন্ময় দত্ত ও রিনা দত্ত

আমরা বর্ধমান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর এবং সারদামায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটি পরিদর্শনে গিয়েছিলাম।ওখান থেকে বিষ্ণুপুর গেলাম, ওখানকার পোড়ামাটি কিংবা টেরাকোটার মন্দির দেখতে।

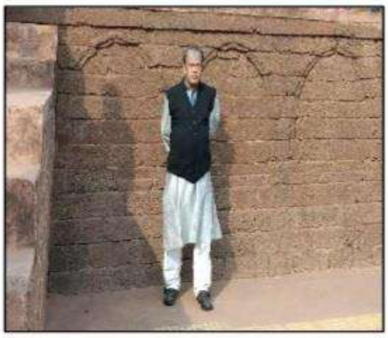

চিত্র ১ ও ২- আমরা বিষ্ণুপুরের মন্দিরের সামনে

রাঢ় বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের এক উল্লেখযোগ্য জনপদ হল মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর। পূর্বে বিষ্ণুপুর ছিল প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী। রাজ্যটি আজকের বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ এবং বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার ছিল। মল্ল রাজা বীর হাম্বির সিংহাসনে বসেন এবং শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই সময় থেকেই বিষ্ণুপুরে একের পর এক টেরাকোটা মন্দির গড়ে ওঠে। কাল ক্রমে বিষ্ণুপুর মন্দির নগরী নামে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে। এখানকার প্রাচীন টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত মন্দির স্থাপত্য গুলি গোটা বিশ্বের ভ্রমণপিপাসু মানুষদের কাছে সমাদৃত।

রাঢ় বাংলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরে লক্ষ্য করা যায়। ইট ও পাথরের- এই দুই উপাদানে গঠিত মন্দির এখানে রয়েছে। তবে 'টেরাকোটার' আশ্চর্য ও উৎকৃষ্ট অলংকরণের জন্য বিষ্ণুপুরের সমকক্ষ আর কোন মন্দির আছে কিনা সন্দেহ। মধ্যযুগের প্রায় সব রীতির- মন্দির ই বিষ্ণুপুরে রঙের নির্মিত হয়েছিল। এগুলি হল – ' রত্ন', 'চালা' ও 'দেউল'। এগুলির মধ্যে সর্বোৎকর্ষের জন্য রত্ন মন্দির গুলির কথায় বেশি করে মনে হয়। তবে প্রাচীনত্ব ও স্থাপত্য গত বৈশিষ্ট্যের জন্য বিষ্ণুপুরের রাস মঞ্চ উল্লেখযোগ্য। রাসমঞ্চের পরেই প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি দেউল রীতির বলে অনুমান করা যায়। রত্ন মন্দিরের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরে একরত্নের সংখ্যা বেশি। ইট ও পাথর উভয় উপাদানে তৈরি 'একরত্ন' মন্দির গুলি সমগ্র বাংলার মধ্যে এই বিশেষ স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিষ্ণুপুরের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির মদনমোহনের 'একরত্ন' মন্দির টি। ইটের তৈরি এই মন্দিরের দেওয়ালে সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মূর্তি ফলকগুলি ছাড়াও ফুল, লতাপাতা নকশা খুব কম মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরের দুর্গ এলাকায় কেষ্ট রায়ের জোড়বাংলা ও শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন এই দুটি ইটের মন্দির স্থাপত্য

চিত্র ৩ - কারুকাজ খচিত মন্দির

ও উৎকৃষ্টমানের অলংকরণের জন্য সুপরিচিত। এ প্রসঙ্গে Archaeological Survey Of India থেকে প্রকাশিত বিষ্ণুপুর শীর্ষক মনোগ্রাফে উল্লেখ রয়েছে।

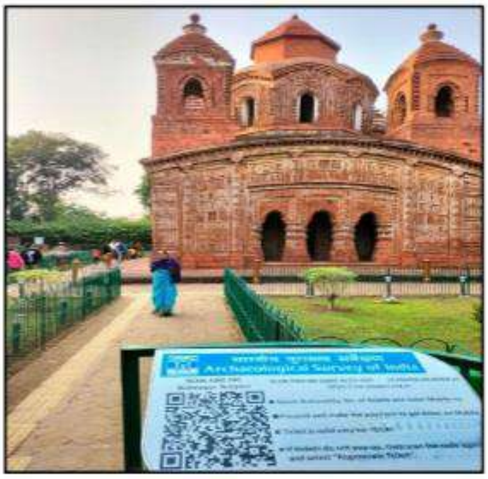

চিত্র ৪ - পুরাতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা সুরক্ষিত একটি সুন্দর মন্দির

নিম্নে পর্যায়ক্রমে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের গঠন রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

রাস মঞ্চ: বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যকে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি দান করেছে এই রাসমঞ্চ। রাসমঞ্চ হল একটা স্টেজ বা মঞ্চ। এর উপরের অংশ পিরামিড আকৃতির আর তার পরের অংশ বাংলার চালা আকৃতির ও এবং প্রবেশদ্বার ইসলামীয় স্থাপত্যকে অনুকরণ করে তৈরি হয়েছে। রাসমঞ্চের নিচের দিকটা মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত। ১৫৮৭- ১৬০০ সালের মধ্যে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির এই রাসমঞ্চটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বিষ্ণুপুরের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরটির উচ্চতা হল ৩৫" ও দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৮০' এবং ৩০' । প্রতিবছর রাগ উৎসবের সময় অষ্টধাতুর ১০৮ টি রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ১০৮ টি প্রদীপ সহ ১০৮ জন ব্রাহ্মণ পূজা করতো। এই সময় প্রজাদের দর্শনের জন্য ঠাকুরগুলিকে গর্ভগৃহের মধ্যে শয়ান দেওয়া হতো। রাস মঞ্চটি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। সবচেয়ে ভেতরের দেওয়ালে বড় বড় আটকানো থাম রয়েছে। থাম গুলিতে পদ্মের আকৃতির মোটিফ দেখা যায়।

পঞ্চরত্ন: ১৬৪৩ সালে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটি নির্মাণ করে ন। এই মন্দিরের উপাস্য দেবতা শ্যামরায়, তাই এই মন্দিরটিকে শ্যামরায় মন্দিরও বলা হয়। বর্তমানে মন্দিরটিকে World Heritage Site হিসাবে মর্যাদা প্রদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে ।এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটির বিশেষত্ব হলো মন্দিরটির পাঁচটি চূড়া পাঁচ প্রকারের। মাঝের চূড়া টি ইসলামীয় অষ্টগণ আকৃতির, এছাড়া রয়েছে রেখ দেউলের নিদর্শন। বাংলার চালা রীতিকে অনুসরণ করে এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটির নির্মাণ পরিকল্পনা করেন মন্দিরের সেবক বিষ্ণুদাস সরকার। মন্দির জুড়ে রয়েছে টেরাকোটার ফলক এবং প্রতিটি রত্নের মধ্যেও রয়েছে টেরাকোটার নতোন্নত খোদাই করা ফলক। মন্দিরটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যে একটা মাত্র খিলানকে কেন্দ্র করে রয়েছে দক্ষিণমুখী

চিত্র ৫- পঞ্চ রত্ন /শ্যামরায় মন্দির

মন্দিরটি , উত্তর দিকে নকল দরজা রয়েছে। এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৩৫′ ও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩০′ ২৪′। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ত্রিখিলান যুক্ত ঢাকা বারান্দা রয়েছে এবং অন্য তিন দিকে কেন্দ্রীয় চূড়াটি সংস্কারের জন্য সিমেন্ট দিয়ে ঢাকা থাকায় মন্দিরের অন্যান্য চূড়ার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যহীন।

জোড় বাংলা : রাজা বীর হাম্বির এর পুত্র রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ সালে এই জোড় বাংলা মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটিকে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোড়া মাটির মন্দিরের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। জোড়বাংলা মন্দিরটি বিষ্ণুপুরে কেষ্ট রায় মন্দির নামে সর্বাধিক পরিচিত।

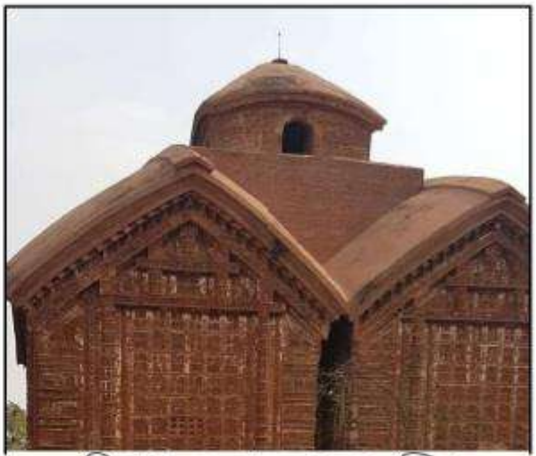
চিত্র ৬- জোড়বাংলা মন্দির

দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩৫′, দৈর্ঘ্যে ৩৮′ ৬″ ও প্রস্থে ৩৮′ ২″। মাকড়া পাথরের উচ্চ ভিতের উপর পোড়ামাটির অলংকৃত টালি বসিয়ে এই মন্দিরটি নির্মিত। দুটি দোচালা রীতির মন্দির কে পাশাপাশি বসিয়ে তার মাথার উপর একটা চারচালা রীতির মন্দিরকে বসিয়ে এক নতুন ধরনের গঠনশৈলী মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে।। এই মন্দিরের প্রথম দোচালার নিচে সামনের দিকে ত্রিখিলান দালান ও দ্বিতীয় চালাটির নিচে গর্ভস্থগৃহের অবস্থান। মন্দিরের ভিতরে দোচালার একপাশ থেকে ওপর চারচালার চূড়ায় পৌঁছবার একটি সিঁড়ি রয়েছে। পিছনের পূর্বদিকে গর্ভগৃহে প্রবেশ করার জন্য একটি অতিরিক্ত দরজা রয়েছে।

একরত্ন: মল্লরাজ রাজা দুর্জন সিংহ ১৬৯৪ সালে এই একরত্ন মন্দিরটি নির্মাণ করেন এই মন্দিরের উপাস্য দেবতা মদনমোহন। এই দেবালয়টি দক্ষিণমুখী। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট আর দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০′১০″ । সাড়ে চার ফুট উচ্চতায় মাকড়া পাথরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ত্রিখিলান যুক্ত দালান রয়েছে এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রয়েছে অগ্রহ যার দৈর্ঘ্য ৪৬ ফুট। বর্তমানে এই মন্দিরটির অনেকখানি ছাদ ধসে পড়েছে। এই মন্দিরটি ত্রিখিলান নির্মিত এবং টেরাকোটার অলংকরণে সজ্জিত । এত বড়ো ইটের দোচালা সৌধ শুধুমাত্র বাঁকুড়া নয়, সারা রাঢ়বঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় না।

চিত্র ৭ - মদনমোহন দেবতার মন্দির

বাঁকুড়ায় অবস্থিত বিষ্ণুপুরে বিখ্যাত ও সুন্দর টেরাকোটা মন্দির গুলো রয়েছে। এই মন্দির গুলো স্থাপত্য কলায় বৈচিত্র্যময়। কিন্তু কালের গতিতে ও সঠিক সংরক্ষণের অভাবে এই অসাধারণ কীর্তি গাঁথা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । এখন দরকার সঠিক পদ্ধতিতে মন্দির গুলোর সংরক্ষণের।

ইউরোপে পা

মধুমিতা দাস

ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফিরতি পথে এক মেম সাহেব কে দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে বাড়ি এসে বলেছিলাম, একজন মেয়ে (মেম) সাহেব দেখেছি, সবাই হেসে উঠেছিল সেদিনের সেই অনভিজ্ঞ মেয়েটা পরিণত বয়সে একদিন পা রাখল ইউরোপে। লন্ডনের হিথরো থেকে যাত্রা শুরু হল দুর্গা পঞ্চমীর রাতে ৬ই অক্টোবর, ২০২৪।

লন্ডনের বিখ্যাত ট্রাফলগার স্কয়ারে নাভাল যুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ আর শহীদদের মূর্তি, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের নিদর্শন, ওপারে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ, রক্ষী বদলের কুচকাওয়াজ দেখলাম। মাদাম তুসোর তৈরি বিদেশি ব্যক্তিদের মূর্তিগুলোর বাস্তবতা আমাদের দেশের বিখ্যাত মানুষদের মূর্তিগুলোর থেকে অনেক বেশি। কি আর করি, মোমের তৈরি রোগা অমিতাভ বচ্চন আর চিপসানো শাহরুখের সাথে ছবি তুললাম। লন্ডনে গথিক স্থাপত্যের অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে টেমস্ নদীর কিনারায় এবং বিভিন্ন জায়গায়। তারই এক ঝলক উন্মোচিত হলো লন্ডন আই –তে করে পরিক্রমা করার সময়, চক্ষু লেহন করে চললাম সব রোস্টোব্যস্থান আর স্থাপত্য কীর্তির ওপর, লম্বা লন্ডন সেতু, বিগবেন ঘড়ি, জলজ যানবাহন, গির্জা, ওয়েস্ট মিনিস্টার আবে এইসব। লন্ডন আই –তে করে ঘোরার সময় হোলি ট্রিনিটি গির্জা হয়তো বা দেখা গেছে, যেখানে শায়িত আছে বিশ্বখ্যাত কথাসাহিত্যিক শেক্সপিয়ার, ছবিতে ধরতে পারিনি। লন্ডন স্তম্ভে (টাওয়ার অফ লন্ডন) নাকি দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো, এর ভেতরে আছে অস্ত্রাগার, কোষাগার যেখানে আছে রাজা রানীদের ব্যবহৃত নানা অলংকার, ভারত থেকে লুট করে নিয়ে যাওয়া আমাদের কোহিনুর।। তাই হয়তো এটা ভারতীয় ভ্রমণার্থীদের সামনে বলাও হয় না বা দেখানো হয় না, সবকিছুর উপর দিয়ে আলো কমে আসছে একটু একটু করে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

ইউরোস্টার ট্রেনে চেপে প্যারিস, প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামে ভেনাসের ভাঙ্গা মূর্তি (ভেনাস ডি মিলো), মোনালিসার হাসি ছুঁয়ে,নেপোলিয়নের গ্যালারি দেখতে গিয়ে পথ হারালাম। এরা ইংরেজি বোঝেনা, অনেক কষ্টে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এলাম। একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে সঙ্গে আছে হাওয়া। ১৮৮৯ তে প্যারিসে আইফেল টাওয়ার তৈরি হয়। প্রচন্ড হাওয়া আর বৃষ্টির জন্য এটা তৃতীয় বা শেষ লেভেলে উঠতে দেয়নি, তাই cruze এ করে ঘোরার সময় ভালোভাবে দেখতে পেরেছি চারিদিক ছোটবেলায় পড়া নোতরদাম গির্জা আর কোয়াসিমেডো - এই শেঈন নদীর তীরে, তা নাকি পুড়ে গেছে ২০১৯ এ! ছবিতে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ১৯৮৯ সালে ওয়াল্টার ডিজনি, ডিজনিল্যান্ড তৈরি করেছে, সেই পার্কে মিকি মাউসের চরিত্রদের নিয়ে যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরোয় সেটা দেখলাম। তারপর গাড়ি ছুটল বেলজিয়ামের পথে, বড় সুন্দর সে শহর।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস, টাউনহলের সামনে গ্রাজুয়েশনের ডিগ্রী পাওয়ার উৎসব চলছিল। আর ছিল ম্যানিকুইন পিস ১৩৮৮তে তৈরি ব্রাসেলীয়দের প্রিয় প্রতীক ব্রোঞ্জের তৈরি ৫০ সেমি দীর্ঘ এক উলঙ্গ বাচ্চা ছেলে ঝর্ণার মধ্যে হিসি করছে, ব্রাসেলীয়রা কোথা থেকে জল পায় তা মনে করায়। এখানকার মিনি ইউরোপের বিখ্যাত স্থাপত্য, স্তম্ভ আর জায়গাগুলোকে মডেল করে প্রদর্শন করা হয়েছে। যেন বড় আকারের আমাদের দেশের ঝুলন। দেখার মতো কিছু না।

আমস্টারডামে একটা ক্যানেল ক্রুসে ঘোরার সময় জানতে পারলাম, প্রিন্সেনগ্রাষ্ট ক্যানালের ধারে ওয়েস্টার্ণআর্কের কাছে সেন্ট্রাল আমস্টারডার্মে অ্যানা ফ্রাঙ্কের বাড়িও দেখা যাবে, যে বাড়িটাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে অ্যানা ফ্র্যাঙ্ক এর বাবা জার্মানি থেকে পালিয়ে এসে উঠেছিলেন। এই বাড়িটার পিছনে একটা গোপন অ্যানেক্সে অ্যানারা লুকিয়ে ছিল হিটলারের ভয়ে বছরের পর বছর।

বিগ বেন, লন্ডন

রক্ষী বদলের প্রসেশন, বাকিংহাম প্যালেস

আইফেল টাওয়ার,প্যারিস

এখানেই লেখা হয়েছিল এক কিশোরীর বন্দী জীবনের খুঁটিনাটি, বাইরে পা না দিতে পারার বেদনা, বিশ্বখ্যাত অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডাইরি। পরে সে ও জার্মানির গেষ্টাপো বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। কেবল বেঁচে গিয়েছিলেন অ্যানা ফ্রাঙ্কের বাবা অটো ফ্র্যাঙ্ক। পরে তিনি তার মেয়ের ডায়েরি প্রকাশ করেন।হায়, দুচোখ মেলেও বাড়িটাকে চিহ্নিত করতে পারিনি। আমস্টারডামে পুরনো সিটি সেন্টারে আছে ইউরোপের সবচেয়ে ছোট বাড়ি, মাত্র ১০ স্কয়ার মিটার, অদেখা রয়ে গেল এ যাত্রায়। এ দেশে লোকেরা সাইকেল চড়তে অভ্যস্ত, সাঁ সাঁ করে নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে সাইকেল চালায়। তাই সাইকেল চালানোর রাস্তা দিয়ে হাঁটা নিরাপদ নয়।

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, এখানে মার্সিডিজ বেনজের মিউজিয়ামে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের গাড়ি রাখা আছে। যেমন যে গাড়ি করে পাপারাৎসিদের   হাত এড়িয়ে পালাবার সময় লেডি ডায়না মারা গিয়েছিলেন, সেই রকম আর কি! তারপর জার্মানির কালো বন, পাইন গাছের মতো বড় বড় গাছে ছাওয়া ,আলো-আঁধারিতে ধূসর, তাই হয়তো নাম ব্ল্যাক ফরেস্ট (কালো বন)। কুকু গাছের তৈরি খড়ি তৈরির অতীত থেকে বর্তমানের বিভিন্ন মডেল দেখলাম।

সুইজারল্যান্ড এর আল্পস পর্বত থেকে নেমে আসা রাইন নদীর ঝরনার জলে সাদা রাজহাঁস গ্রীবা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।, গাড়ি চলেছে ইন্টারলেকেনের (দুটো লেকের মধ্যবর্তী অংশ) পথে, ছবির মত সুন্দর শহর। ইন্টারলেকেনে যশ চোপড়াকে বলা হয় গ্রান্ড অ্যাম্বাসেডর। ওনার অনেক সিনেমার শুটিং এখানে হয়েছে যা এই জায়গাটাকে প্রসিদ্ধ করে তুলেছে। ওনার একটা মূর্তি তৈরি করে রাখা আছে এখানে। কেবল-কার ও পরে ট্রেনে চেপে জাৎফ্রাউয়োচ ১১০০০ ফুট উঁচুতে ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে সাথে তুষারপাত । যেখান দিয়ে আইসবার্গ দেখার কথা ছিল সেখানে সবকিছু সাদা, কিছু বোঝা যাচ্ছে না, বরফের প্রাসাদ, পা টিপে টিপে ঢুকলাম । এটা ইউরোপের দীর্ঘতম গ্লেসিয়ার এ্যালেটসের ভিতরে, যেটা মঞ্চ আর জাৎফ্রাউ শৃঙ্গের মধ্যে। এই বরফের প্রাসাদে অনেকগুলো গ্যালারি, তাতে আছে বরফের তৈরি বিভিন্ন জীবজন্তু ও মূর্তি । হি হি করে হাড় হিম করা ঠান্ডায় ঘুরে বেড়ালাম বরফের তৈরি একটা থেকে অন্য অলিন্দে। ট্রেনে করে নামার পথে, সবাইকে একটা করে সুইস চকলেট দেওয়া হল। বার্ণ আইম্যাক্সে আইনস্টাইনের একটা মিউজিয়াম আছে, দেখা হয়নি। আছে নেপোলিয়নের বাড়ি জুড়িখে, তাও রইলো অধরা । দুঃখ ভুলিয়ে দিল গাড়ি চলার পথে দু ধারে চোখ জুড়ানো সবুজ মাঠ এবং খামারবাড়ি।

পরের দিন মাউন্ট টিটলিস, ১০০০০ ফুট উঁচুতে, কেবল কার নামিয়ে দিল আইজেলবার্গ, একটা সাসপেনশন ব্রিজ দিয়ে বরফে ঢাকা পাহাড়ের উপর দিয়ে ক্লিফ ওয়াক করলাম। গুড়ি গুড়ি বরফ পড়ছে, নিচে নেমে এলাম। বিকেলে লুসারণে লেকে ক্রুজ করে ঘুরে বেড়ালাম। সুইজারল্যান্ডের লুসারনেতে পাহাড়ের ভিতর চোখের জল ফেলা সিংহ ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবে মৃত সুইস শহীদদের স্মরণে তৈরি করা হয়েছে। সুইস ব্যাংক এ টাকা রাখা হয়নি, কারণ মোটে 10 সুইস ফ্র্যাঙ্ক পড়ে আছে আমার থলিতে।

সুইজারল্যান্ড আর অস্ট্রিয়ার মাঝে আছে ছবির মত ছোট্ট দেশ লিচেনস্টাইন, আগে সুইজারল্যান্ডের সাথে ছিল তাই এখানে সুইস, ফ্র্যাঙ্ক আর ইউরো, দুটোই চলে। এর রাজধানী ভাদুপ। টয় ট্রেনে চেপে হিন্দিতে দেওয়া কমেন্টারি শুনতে শুনতে রোদ ঝলমলে পরিচ্ছন্ন শহরটাকে ঘুরে নিলাম। দেখলাম, পাহাড়ের ওপর রাজপুত্রের বাড়ি, পথে একটা ভূতের বাড়িও দেখা গেল। তিন চারটে ভাই মারামারি করে মারা গিয়েছিল, এখন ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সত্যি কিনা জানিনা।

গাড়ি ছুটে চলল অস্ট্রিয়ার দিকে। ইন্সব্রুকে স্বরোভস্কি, এর ক্রিস্টাল আর রত্ন পাথরের তৈরি জুয়েলারি, ঘর সাজানোর জিনিস দেখতে খুব সুন্দর। স্বরোভস্কির ক্রিস্টালের প্রদর্শন দেখবার মত তবে সঙ্গে টাকা থাকা দরকার। আলো ঝলকাচ্ছে চতুর্দিকে কি নেই ক্রিস্টালের তৈরি গাছ মূর্তি জুতো আর হারদুল তো আছে। একটা বরফের ঘর সেখানেও ক্রিস্টালের বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করে রাখা আছে তারপর হেঁটে হেঁটে দেখলাম টাইরোলিয়ান স্টেট থিয়েটার লাইব্রেরী গির্জা ইত্যাদি পথে পড়ল ইন নদীর ওপর ব্রুক বা ব্রিজ (যার নামে ইন্সব্রুক)তা পেরিয়ে পাহাড়ের উপর আমাদের হোটেল এখানে সব হোটেল গুলোই নাকি এমনই পাহাড়ের উপর। গাড়ি যেতে পারে না। ছোট ছোট ব্যাগ নিয়ে আসা হয়েছে সেগুলো নিয়ে হেঁটে হেঁটে হোটেলে উঠলাম। অস্ট্রিয়ার সালৎবার্গে জগত বিখ্যাত সুরকার মোৎজার্টের জন্মস্থান, অনেকটা দূরে আমাদের হোটেল থেকে, তাই না দেখে ছুটে চললাম ভেনিসের পথে।

সেন্ট মার্কস স্কয়ার, ভেনিসের সবচেয়ে বড় স্কয়ার । এটি সেন্ট মার্কস ব্যাসিলিকার সূক্ষ্ম কারুকার্য, আর্চ এবং বাইজ্যানটাইন সময়ের স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ। তাছাড়া এটা ভেনিসীয়দের

ম্যানিকিন পিস, ব্রাসেলস   সুইজারল্যান্ড, রাস্তা থেকে   বরফের প্রাসাদ, জাংফ্রাউযোচ

স্বাধীনতা সম্পদ আর শক্তির প্রতীক। তারপর গন্ডোলা চড়ে গ্র্যান্ড ক্যানালে ঘুরে বেড়ানো, যে খালে গন্ডোলা চলে সেখানে বিভিন্ন বাড়ি, হোটেল, দোকানের বর্জ্য জল এসে পড়ে। নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা সত্বেও গন্ডোলা করে ঘোরবার সময় বাজে গন্ধ পাচ্ছিলাম। গন্ডোলা গুলো কিন্তু দেখতে ভারী সুন্দর। খালের ধারে ছোট ছোট দোকান করে বাংলাদেশিরা পুরো জাঁকিয়ে বসেছে।

এরপর ফ্লোরেন্স, এটা ১৫ শতকের শিল্পকলার কেন্দ্র ছিল। এখানেই রেনেসাঁসের উদ্ভব যার পরিচয় ছড়িয়ে আছে স্থাপত্যের বিভিন্ন নিদর্শন এর লাল পাথরের তৈরি ড্যুমো গির্জা। আরনো নদীর তীরে বিভিন্ন স্থাপত্য ইতালির ঐতিহ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে স্যান্টাক্রুজ ব্যাসিলিকা পৃথিবীর বৃহত্তম ফ্রান্সিস্কান গির্জা এখানেই অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন মাইকেল এঞ্জেলো আর গ্যালিলিও। যদি একটু ভিতরে গিয়ে দেখতে পারতাম। গ্যালিলিও গ্যালিলাই পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকের অধ্যাপক ছিলেন।

পৌঁছে গেলাম ফ্লোরেন্সের Piazza della Signoria, এটা ১৪ শতক থেকে ফ্লোরেন্সের রাজনৈতিক আর সামাজিক সভা সমিতির কেন্দ্রস্থল। এখানে আছে ফাউন্টেন অফ নেপচুন,Palazzo Vecchio যার ঢোকার পথে ডেভিডের মূর্তি একখণ্ড পাথর দিয়ে তৈরী , পাশে পারসিয়ুসের হাতে ধরা মেডুসার মুন্ড,কথিত আছে মেডুসা ছিল এক সুন্দরী, শক্তিময়ী নারী, যার মাথা থেকে সাপ ঝুলতো, পারয়িয়ুস তার মুণ্ডচ্ছেদন করে, পরে মেডুসার কাটা মুন্ড গ্রীক দেবী এথেনাকে অর্পণ করা হয়। Palazzo Vecchio ডান দিকে ১৩৭৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত Loggia dei Lanzi, এই তিন দিক খোলা স্কাল্পচার গ্যালারিতে প্রদর্শিত বিভিন্ন মূর্তি স্তম্ভ ও ভাস্কর্য তখনকার শিল্পীদের স্থাপত্য আর হস্তশিল্পের সূক্ষমতা আর পারদর্শিতার পরিচয় বহন করে চলেছে। অধিকাংশ স্তম্ভের উপর খোদিত সিংহের মূর্তি ফ্লোরেন্সিয়দের শক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পায়ে পায়ে চলে এলাম রোম। রোমের প্রথম রাজা ছিলেন রোমুলাস । তাই রোমকে রোমা ও বলা হয়। রোমের সেই কলোসিয়াম যেখানে বন্দীদের যুদ্ধ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো হিংস্র পশুদের সামনে, আর চারধারে গ্যালারিতে বসে থাকা রাজা-মহারাজারা গোঁফে তা দিতে দিতে বা মদীরা সেবন করতে করতে সহাস্যে উপভোগ করতেন সেই হিংস্র পশুর গর্জন আর মৃত্যুভয়ে ভীত বন্দীদের সকরুন আর্তনাদ। মনুষ্যত্বের কি নিদারুণ অবমাননার নিদর্শন।

কলোসিয়াম, রোম **সাণ্টা ক্রোস বাসিলিকা, ফ্লোরেন্স** **হেলানো টাওয়ার, পিসা**

রোমের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে টাইবার নদী আর আছে ট্রেভী ঝরনা যা সারা শহরের জল সরবরাহ করে থাকে। এটা রোমান সভ্যতার প্রাচুর্য ও সম্পদের প্রতীক।

এবারের গন্তব্য ভ্যাটিকান সিটি, ইউরোপের সবচেয়ে ছোট রাজ্য, পোপের অনুমতি ব্যতীত এখানে থাকা নিষেধ, ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের সিসটিন চ্যাপেল, সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকা। গাইড এর সাথে দৌড়ে দৌড়ে প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ পেরিয়ে চললাম, ভৌগোলিক গ্যালারিতে সারা পৃথিবীর ম্যাপ প্রদর্শন করা আছে, যার ওপর ভিত্তি করে আজকের গুগল ম্যাপ তৈরি হয়েছে। একটা হোলি প্রকোষ্ঠে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি রাখা আছে, সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা ইউরোপের বিখ্যাত গির্জা গুলোর মধ্যে একটি, যীশু খ্রীষ্টের অনুগামী সেন্ট পিটার এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

ক্রুশবিদ্ধ যীশু মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর আঁকা ফ্রেসকো সিস্টিন চ্যাপেল

ভ্যাটিকান সিটি

পোপ যেখান থেকে সবাইকে আশীর্বাদ দেন, হোলি দরজা, যা পেরিয়ে গেলে লোকে পাপ মুক্ত হবে। এসব দেখে আমাদের নিয়ে বাস ছুটলো আর একটা শহরের দিকে।

ইটালির আরিজো শহর থেকে বেরোবার রাস্তাটা ভারী সুন্দর। অনেক জায়গা নিয়ে এক একটা বাড়ি, প্রতিটি বাড়ি গাছ গাছালিতে ভরে আছে। মনোরম পরিবেশ। গাড়ি ছুটেছে পিসার পথে, পিসার হেলানো স্তম্ভ, পিসার বেল টাওয়ার জলকাদা জায়গায় তৈরি করা হয়। ১৩৫০ সালে পুরো তৈরি হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায় যে এটা ধীরে ধীরে হেলে পড়ছে। তারপর ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ অনুযায়ী এটা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়। সম্প্রতি ২০০৮ সাল থেকে এর হেলে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ততদিনে হেলানো টাওয়ার হিসেবে এটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শেষ গন্তব্য ইতালির মিলান, মিলানের কোমো হ্রদের ধারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত শহীদদের স্মরণে একটা স্মৃতির স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। হ্রদের চারপাশে গাছগুলোর মাথা ডোমের মতো করে রাখা, দেখতে ভালো লাগছিল। মিলানের Duomo di Milano গির্জা ইটালির বৃহত্তম এবং পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম গির্জা, এর সামনে অনেক পাথরের মূর্তি ও স্তম্ভ রয়েছে। বাস আমাদের নামিয়ে দিল মিলান বিমানবন্দরে। সাঙ্গ হল আমার ১৭ দিনের ইউরোপ ভ্রমণ।

মণিপুর ও নাগাল্যান্ডে কয়েক দিন

বিনয় কুমার সাহা

মণিপুর ভ্রমণের সেরা সময় অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস। এপ্রিলের পর থেকে এখানে বেশ গরম পড়ে প্রায় সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এখানে বেশ গরম থাকে। যদিও সকাল এবং সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়া বরাবরই মনোরম থাকে। মণিপুর শব্দের অর্থ হল, "মণির দেশ"। এই সময়ে মণিপুর ও নাগাল্যান্ড এই দুটো রাজ্য নিজেদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবে রঙিন হয়ে সেজে ওঠে। আমরা এবার সেই উৎসবে সামিল হতে পেরেছিলাম। ২৯শে নভেম্বর আমাদের ARICARE থেকে ষোল জনের একটি দল কোলকাতার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সকালে রওনা দিলাম মণিপুরে সাংগাই উৎসবে অংশ গ্রহণ করবো বলে । এখানে আমরা থাকবো তিন দিন তিন রাত। আমরা সময় মতো মণিপুরের বীর তিকেন্দ্রজিত্ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম ।

এন.এস.সি. বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে

বিখ্যাত প্রজাতির হরিণ 'সাংগাই

মণিপুরে ট্যুরিস্টদের প্রবেশ করার জন্য একটা ইনার লাইন পারমিট লাগে। নিজের পরিচয় প্রমাণপত্র দেখিয়ে ১০০ টাকা ফী জমা করলে ১৫ দিন মণিপুর ভ্রমণের পারমিট ইম্ফল বিমানবন্দরের কাউন্টার থেকেই দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেই পারমিট প্রত্যেকে সংগ্রহ করার পর হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে মাত্র ৭ থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আমাদের হোটেল ক্লাসিক এ গিয়ে পৌছলাম। আমরা তিনদিন এই হোটেল ছিলাম। নিজেদের রুম বুঝে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে হোটেলে লাঞ্চ সেরে বেলা আড়াইটার মধ্যে বেড়িয়ে গেলাম যেখানে সাংগাই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই মেলা প্রাঙ্গনের উদ্দেশ্যে। মণিপুরকে এক বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর ২১ থেকে ৩০ শে নভেম্বর এই রাজ্যে 'সাংগাই উৎসবের' আয়োজন করা হয়। এই সাংস্কৃতিক উৎসবের নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত প্রজাতির হরিণ 'সাংগাই' এর নামে (ব্রো-এন্টলারড সাংগাই ডিয়ার) যা শুধুমাত্র মণিপুরের 'কেইবুল ল্যামডাও ন্যাশনাল পার্কে' দেখতে পাওয়া যায়।

সাংগাই উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য মণিপুরের সংস্কৃতি, হস্তশিল্প, কলা, স্পোর্টস, মিউজিক্, ক্যুইজিন, ইত্যাদি ছাড়াও মণিপুরের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা। মণিপুর সরকার ও ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এই উৎসব মণিপুরের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে উপত্যকীয় স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের উৎসবের থিম ছিল 'ফেস্টিভাল অফ ওয়াননেস'। ২৯ শে নভেম্বর সকালে ইম্ফল পৌঁছে সেদিন বিকেলেই আমরা সাংগাই উৎসবে সামিল হলাম। আমাদের

হোটেল থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরেই ছিল এই উৎসবের প্রধান মেলা প্রাঙ্গন। মেলা প্রাঙ্গনের পাশেই অবস্থিত অল ইন্ডিয়া রেডিও -ইম্ফল কেন্দ্র, মণিপুর স্টেট ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং সিটি কনভেনশন সেন্টার। মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা দিয়ে টিকিট কিনে আমরা মেলায় প্রবেশ করলাম। মেলার প্রবেশপথের বড়ো তোরণটি সুন্দর করে সাজানো। স্থানীয়, দেশী ও বিদেশীদের সমাগমে মেলা প্রাঙ্গন গমগম করছে। মেলার প্রবেশপথের কিছুটা দূরেই আলো দিয়ে সাজানো রয়েছে এক মঞ্চ। মেলার ভিতর বিভিন্ন ধরণের দোকান যেখানে বিক্রি হচ্ছিল মণিপুরী ড্রেস, ওখানকার ট্র্যাডিশনাল খাবার, নানারকমের বাসন, ইত্যাদি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিক্রেতাদের পসরাও চোখে পড়ল। এছাড়া মেলার এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোটো ছোটো খোলা মঞ্চ – একের পর এক পারফরম্যান্স হয়ে চলছে। আমাদের একটা মঞ্চ দৃষ্টি আকর্ষণ করল যেখানে মণিপুরী ফোক ড্যান্স হচ্ছিল। আমরা কিছুক্ষণ সেখানে সময় কাটালাম। এই মেলা প্রাঙ্গনের আর একদিকে ছিল বিখ্যাত 'ভাগ্যচন্দ্র ওপেন এয়ার থিয়েটার' মঞ্চ। সেখানে হবে মূল অনুষ্ঠান শুরু বিকেল পাঁচটা থেকে। সেজন্য মেলার এদিক ওদিক একটু ঘুরে সাড়ে চারটেয় আমরা সেই মঞ্চে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্যালারি কিন্তু পুরোপুরি সিমেন্টের তৈরী এবং মঞ্চটা সাজানো মণিপুরী কায়দায়।

সেইদিন ছিল এই উৎসবের নবম দিন। মনিপুর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর পরিবার সহ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বেশ কয়েকটা দেশের রাষ্ট্রদূত এবং এই রাজ্যের ও প্রতিবেশী রাজ্যের গন্যমান্য ব্যক্তি সেইদিন উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছলে ওঁনাকে ও অন্যান্য অতিথিদের সম্বর্ধনা জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে মণিপুরের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি তাদের ট্র্যাডিশনাল পোশাকে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে চলছিল। প্রত্যেক নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হচ্ছিল মণিপুরের দৈনন্দিন জীবনের গল্প নিয়ে তা সে চাষবাসই হোক্ বা মার্শাল আর্টই হোক বা কোনো সামাজিক সমস্যা হোক। একের পর এক অনুষ্ঠান দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করছিলাম। বেশ শীত লাগছিল, তবু অনুষ্ঠান ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না । কিন্তু হোটেলে ফেরার সময় হয়ে গেছে। মেলার বাইরে আমাদের জন্য বাস অপেক্ষা করছে হোটেলে ফিরে যাবার জন্য। মন না চাইলেও অগত্যা উঠে পড়তে হলো।

মণিপুর দর্শনের **দ্বিতীয় দিন** - আজ আমরা প্রথমে যাবো 'রেড হিল'। 'রেড হিল' বা 'মেইবাম লোকপা চিঙ' মণিপুরের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান।স্থানটি ইম্ফল থেকে ১৭ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এখানে জাপানি ও ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে অনেক জাপানি সৈন্য হতাহত হয়েছিল এবং তাদের রক্তধারা টিলার গা বেয়ে নীচে নেমে এসেছিল। রক্তের রং এ লাল হয়ে গিয়েছিল টিলা। তাই স্থানীয়দের কাছে এই টিলা 'রেড হিল' নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে মৃত জাপানি সৈন্যদের স্মৃতিরক্ষার্থে টিলার পাদদেশে নির্মাণ করা হয়েছে ' ইন্ডিয়া পিস মেমোরিয়াল'। এটা ভারতবর্ষে একমাত্র জাপানি যুদ্ধ মেমোরিয়াল। জাপানিদের কাছে এটা একটা তীর্থস্থানও বটে। জন কোলাহল থেকে দূরে এখানকার শান্ত পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে দিল। রেড হিলের ঠিক নিচে একটা মিউজিয়াম আছে। আমরা মেমোরিয়াল দেখে মিউজিয়ামের ভিতর প্রবেশ করলাম। মিউজিয়ামের নাম 'ইম্ফল পিস মিউজিয়াম'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মণিপুরে যতো সংঘর্ষ হয়েছিল (মার্চ - জুলাই, ১৯৪৪), এই মিউজিয়াম তারও স্মৃতি বহন করছে। আমরা ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এরপর আমাদের গন্তব্য মৈরা (Moirang), ইম্ফল থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মৈরা একটা বিশেষ জায়গা। ভারতে এই জায়গাতেই স্থাপিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রধান অফিস। প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসনের গোলামি থেকে মুক্তি ঘোষণার পরে ১৯৪৪ সালের ১৪ই এপ্রিল ভারতের মাটিতে এই জায়গাতেই সর্বপ্রথম স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির কর্ণেল সওকত মালিক। সেই তেরঙ্গা আজও এখানে গর্বের সঙ্গে পতপতিয়ে উড়ে চলেছে। এছাড়া আই.এন.এ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) এর শহীদ সৈন্যদের মৃতদেহগুলিও মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স এর ভিতর সমাহিত করা আছে। এখানকার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা আছে - নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সংগঠন, ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা,স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার ও মন্ত্রীসভা গঠন, ভারত ছেড়ে তার বিদেশ গমন, বিদেশের সাথে মৈত্রী এবং প্রতিরক্ষাসন্ধি স্থাপনের তথ্যাদি (চিঠিপত্র, ছবি, ইউনিফর্ম, ব্যাজ্ ও অন্যান্য যুদ্ধ স্মারক)। যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের মহান আত্মত্যাগের কথা। এছাড়া রয়েছে সমকালীন ইতিহাস সমৃদ্ধ বই দিয়ে সাজানো একটা লাইব্রেরী।

মিউজিয়ামের গেটে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি আছে। আমার শহরের স্বনামধন্য ভাস্কর 'শ্রীযুক্ত কার্তিক চন্দ্র পাল' মহাশয় এই মূর্তির নির্মাতা।

তৃতীয় দিন : দর্শনীয় স্থান যেমন ইবুধৌ পাখাঙবা মন্দির, ইসকন মন্দির, মণিপুর স্টেট মিউজিয়াম, কাংলা দুর্গ, শহিদ মিনার, গোবিন্দজি মন্দির ইত্যাদি দেখার পর মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি।

ইসকন মন্দির, মণিপুর

কাংলা দুর্গ, মণিপুর

লোকটাক লেকে বোটিং

শহীদ মিনার, মণিপুর

ইম্ফলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হল লোকটাক হ্রদ এটি রাজ্যের একটি স্বাদু জলের হ্রদ। এখানে বোটিং এর ও ব্যবস্থা আছে। এই হ্রদের মধ্যে রয়েছে একটি দ্বীপ। দ্বীপের নাম সেন্দ্রা। এটি মণিপুরের বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় পর্যটনক্ষেত্র। হানিমুন কাপলদের ভিড় এখানে প্রায় সারা বছরই থাকে। সাধারণ পর্যটকরা এখানে ভিড় করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে। হ্রদের আয়তন সর্বোচ্চ ৫০০ বর্গকিলোমিটার। বর্ষায় হ্রদের আকার বৃদ্ধি পায়। মণিপুরের মোইরং এলাকায় অবস্থিত এই হ্রদ বিখ্যাত তার ভাসমান দ্বীপের কারণে। প্রায় ৪০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে অবস্থান করে । এই ভাসমান দ্বীপটি। দ্বীপে রয়েছে বিশ্বের একমাত্র ভাসমান জাতীয় অভয়ারণ্য কেইবুল লামজাও ন্যাশনাল পার্ক। এই অভয়ারণ্যে রয়েছে বিখ্যাত মণিপুরী সাংগাই হরিণ। এটি বিলুপ্ত প্রজাতির হরিণ ।

এবার হোটেলে ফেরার পালা কিন্তু সবার ইচ্ছে একটু মার্কেটিং করার তাই আমাদের ড্রাইভার মণিপুরের বিশ্ববিখ্যাত বাজার ইমা কেইথেলে নামিয়ে দিল। বাজারটি পরিচালনা করেন শুধুমাত্র মহিলারা। সর্ব ধর্ম নির্বিশেষে মহিলারা এই বাজারে পণ্য বিক্রি করতে আসেন। প্রায় তিন হাজার মহিলা ব্যবসায়ী এই বাজারে ব্যবসা চালান। সারিবদ্ধভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে এখানে কেনা বেচা হয়। খাবার, হস্তশিল্পের পণ্য, গৃহস্থালীর জিনিস থেকে শুরু করে সবই মেলে এখানে। মহিলা চালিত এই বাজারের সুনাম রয়েছে বিশ্বজুড়ে। বহু বিদেশি পর্যটক শুধু এই বাজারের টানেই এখানে বেড়াতে আসেন। নারীশক্তির এক বিশাল উদাহরণ এই 'ইমা কেইথেল' বা মায়েদের বাজার। সরকারিভাবে বাজারের প্রতিষ্ঠা হয় ব্রিটিশ আমলে, সালটা ১৯৩৯। সেই বাজার এখনও চলছে রমরমিয়ে। যদিও স্থানীয়দের দাবি এই বাজারটি চলছে সপ্তদশ শতক থেকে। সবাই কিছু না কিছু নিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর গাড়ি এসে পৌছল। আমাদের নিয়ে হোটেলে সবাই ফ্রেস হয়ে ডিনার সেরে যে যার রুমে চলে গেলাম।

চতুর্থ দিন: আমাদের গন্তব্য নাগাল্যান্ড। মনিপুর থেকে নাগাল্যান্ড যেতে ৪ ঘন্টা মত সময় লাগে। আমরা যখন নাগাল্যান্ডে হোটেল মিলেনিয়াম পৌছলাম তখন বিকেল ৪ টা হবে।

পঞ্চম দিন: আজ হর্নবিল উৎসবে যাবার জন্য সবাই তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম কিসামা হেরিটেজ ভিলেজ স্টেডিয়ামের দিকে। খুব সুন্দর পরিবেশ,এক পাহাড়ের কোলে স্টেডিয়ামটা তৈরি। এখানে চারটি পারফরম্যান্স দেখে লাঞ্চ করতে যাওয়া হলো।

ষষ্ঠ দিন: এদিনের গন্তব্য ছিল ওয়্যার সেমেট্রি গ্যারিসন হিলে অবস্থিত কবরস্থান, যেখানে 2,337টি কবর রয়েছে। কমনওয়েল্থ যুদ্ধ সমাধি কমিশন এই গোরস্থানটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। ব্রোঞ্জের ফলক সহ ছোট পাথরের চিহ্নিতকারী এই সমাধিগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃত ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যদের স্মৃতিরক্ষা করে গ্যারিসন হিলে ওয়্যার সেমেট্রি, কোহিমা।

সপ্তম দিন: আজকে আমাদের গন্তব্য খামিমা উপজাতিদের গ্রাম দেখা, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা, তাদের বাসস্থান ইত্যাদি। আমরা একটা পরিবার বেছে নিলাম এবং তাদের ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখলাম - বাসন পত্র, ধান ভাঙার ঢেকি, ধানের গোলা, জন্তু জানোয়ারের কঙ্কাল দিয়ে ঘর সাজানো ইত্যাদি। পরের দ্রষ্টব্য ক্যাথলিক গির্জা, পাহাড়ের ওপর যে এত বিশাল গির্জা থাকতে পারে আমাদের ধারনা ছিল না।

অষ্টম দিন: আমাদের ফ্লাইট ডিমাপুর বিমান বন্দর থেকে। হোটেল থেকে বিমানবন্দর ৪-৫ কিমি দূরত্ব। আমাদের ফ্লাইট ঠিক সময় ছিল এবং সন্ধ্যার আগেই অনেক স্মৃতি নিয়ে পরের ভ্রমণের অঙ্ক কষতে কষতে বাড়ি ফিরলাম।

মুশকিল আসান

মধুমিতা দাস

সদ্য এমএসসি পাস করে বেরিয়েছি, এদিক-ওদিক চাকরির দরখাস্ত জমা দিতে যাই, সেই রকমই একদিন ধর্মতলার মোড়ে বাস থেকে নামছি, চটি ছিড়ে গেল ফটাস করে, এমনভাবে ছিড়লো যে সেফটিপিন লাগানোর কোন জায়গা নেই, আর ওই চটি পায়ে মুচির কাছে যে যাব তাও সম্ভব ছিল না, হঠাৎ দেখি চোয়াড়ে মতন লোক এগিয়ে এসে আমাকে বলছে 'আসুন' আমার সাথে, বয়স অল্প, ব্যাগে পয়সাও বিশেষ নেই, একটু কিন্তু করছিলাম, তার পরে ভাবলাম চারিদিকে ফটফট করছে দিনের আলো, লোকজন হাঁটাচলা করছে, আমার আর কি করবে? ভয়ে ভয়েই লোকটার পিছন পিছন সার সার দোকানের পাশ দিয়ে একটা জায়গায় এলাম, সেখানে একটা দোকান ঘরে অনেক ছেঁড়া খোঁড়া চটি গাদা হয়ে পড়েছিল, লোকটা আমাকে একটা চটি বেছে নিতে বলল, আমি আমার পায়ের মাপে একটা চটি নিয়ে পরে নিলাম। টাকা দিতে গেলে লোকটা কিছুতেই নেবে না, জোর করে ওনার হাতে ১০ টাকা গুঁজে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। আমার অসুবিধা দূর হলো।

শিলংয়ে আমার একজন সহকর্মীর ফুসফুসে কর্কট রোগ বাসা বেঁধেছিল, চিকিৎসা করাতে উনি ভেলোর গিয়েছিলেন। আমি যখন কলকাতায় আছি, শিলং এর অফিস থেকে আমায় ফোন করে জানালো যে উনি (বি পি সিং) ট্রেনে করে ভেলোর থেকে ফিরছেন। অবস্থা ভালো নয়। যদি কিছু দরকার হয় তাই আমি যেন হাওড়া স্টেশনে ওনাদের সাথে দেখা করি। আমি পরের দিন ছুটি নিয়েছিলাম,স্টেশনে পৌঁছে গেছিলাম আগেই,ভেলোর- গৌহাটি ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকছে, আমিও পায়ে পায়ে এগোচ্ছি নির্দিষ্ট কামরার দিকে। দেখি বি পি সিং এর সাথী চন্দ্রশেখর দৌড়ে দৌড়ে সামনের দিকে আসছে, আমাকে দেখতে পেয়ে এক নিঃশ্বাসে জানালো যে বি. পি. সিং দুপুরের খাবার খেয়ে শুয়ে ছিলেন।, খড়গপুরে গাড়ি ছাড়ার পর উনার হেঁচকি ওঠে তারপর মারা যান। ট্রেনে একজন যাত্রী ছিলেন ডাক্তার, উনি পরীক্ষা করে ওনাকে মৃত ঘোষণা করেন। গাড়ির ড্রাইভার এবং গার্ড রেল পুলিশকে খবর দিয়েছে, মৃতদেহ প্লাটফর্মে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তাই আজ রাত্রে রেলের মর্গে দেহ রাখা হবে। কাল পোস্টমর্টেম হবে। তারপর ওনার দেহ বাড়ির লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। হাওড়া স্টেশনের পুলিশেরা তখন যেভাবে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে,ছিল তা লিখে বোঝাতে পারবো না, কিভাবে ট্রেনের মধ্যে মারা গেল, তার বিবরণ লিখে জমা দেওয়া, রেলের কুলিদের দিয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠানো,বরফের চাঁই কিনে দেহের ওপর চাপানো, সব জায়গা থেকে কাগজপত্রের কপি নেওয়া, এইসব, আমার ভাইয়েরা, ছোট ভগ্নিপতি, ওরাও ইতিমধ্যে হাওড়াতে এসে গিয়েছিল,কিন্তু পুলিশের সাহায্য না পেলে এতসব করে উঠতে পারতাম না ।কৃতজ্ঞতায় ভিজে যায় অন্তর।

একদিন জ্বর আসছে, চাদর মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছি, অফিস আজ ছুটি, আমার সামনের ফ্ল্যাটের সুলোচনা, বোধ হয় লক্ষ্য করেছিল যে সারাদিন আমি জানলা খুলি নি বা বাইরে বার হইনি। দুপুর বারোটা নাগাদ ও দেখি কলিং বেল বাজাচ্ছে।, আমি দরজা খুলে মুখ বাড়ালে জিজ্ঞাসা করল "কি হয়েছে ?" বললাম, "শরীর ভালো নেই"। দরজা খোলা রেখেই এসে শুয়ে পড়েছি। সুলোচনা এসে দেখলো গ্যাস জ্বালানো হয়নি, ও আমার জন্য চা করে নিয়ে এলো। ভাত তরকারি এনে রাখল, আমি যত বলছি যে কিছু লাগবে না, ওষুধ খেয়েছি একটু পরে আমি ঠিক হয়ে যাব। কে শোনে কার কথা! ভেবেছিলাম আজ কপালে হরিমটর আছে। তা কিন্তু হলো না।

চন্দ্রশেখরপুর হাউসিং-বোর্ড কলোনির একটা ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতাম। এক একটা ফ্লোরে ছটা করে ফ্ল্যাট, আমি থাকতাম দোতলায় । সারাদিন খাটুনির পর গভীর ঘুমে রাত কেটে যেত। এইরকমই একদিন গভীর রাত্রে খুব জোরে কলিং বেল বাজছে আর দরজাতেও দুমদুম করে ঘা পড়ছে, ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে প্রথমে তো বুঝতেই পারছি না যে স্বপ্ন দেখছি না সত্যি সত্যি বাইরে কেউ দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলে দেখি ওপর তলার সুইটির মা ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, ভূমিকম্প হচ্ছে তাই আমাকে ডেকে দিয়ে নিচে নামছে, বাড়ি তখনও কাঁপছে, গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বাড়ির বাইরে

এসে দাঁড়ালাম আরো এক দুবার ভূমি কেঁপে উঠল। যদি আমায় ডেকে না দেওয়া হতো, আমি তো কিছুই টের পেতাম না।ভাগ্যিস, কম্পন জোরদার ছিলনা, নচেৎ ঘুমের ঘোরে চাপা পড়তাম।

ডায়রিয়া হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে গেলে ভাইয়ের সাথে কলকাতা আসছি। শরীরে জোর নেই। বেশি হাঁটলে মাথা টলমল করে, সাত আট ঘন্টা জার্নি করে হাওড়া পৌঁছেছি। তারপরেও খানিকটা হেঁটে একটা হলুদ ট্যাক্সিতে ধরেছি, স্টেশন চত্বরের পুলিশ বাইরে থেকে যাত্রী ওঠাচ্ছে বলে হেই হেই করে ধেয়ে এলো আমি সেই পুলিশটিকে বললাম যে আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমাকে একটা গাড়ি করে দিন। এক মুহূর্ত আমাকে দেখে পুলিশটি আমাদের শুধু ওই ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিল তা নয় ট্যাক্সি ওয়ালাকে বলে দিল মিটারে যা ভাড়া উঠবে তার থেকে যেন এক টাকাও বেশি না নেয়। ওনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

আমেরিকার ইন্ডিয়ানাপোলিস শহর। খ্রীষ্টমাসের ঠিক আগে পার্দু ইউনিভার্সিটি থেকে হেঁটে বাসায় ফিরছি, অনেকটা রাত হয়ে গেছে, বাসের জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাস না পেয়ে হাঁটা ধরেছি, জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছি। একটা গাড়ি ধাক্কা মারল, আমি পড়ে গেলাম, গাড়ির চালক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমায় কিছু বলল, ভুলটা আমারই ছিল। আমেরিকাতে ট্রাফিক আইনের খুব কড়াকড়ি, পুলিশ যদি এসে আমায় ধরে বা ফাইন করে এই ভেবে আমি তাড়াতাড়ি উঠে আবার হেঁটে চলেছি বাসার দিকে। একটা গাড়ি পাশে এসে দাঁড়ালো, কোথায় যাব জিজ্ঞেস করে আমাকে গাড়িতে উঠতে বলল।আমার তখনও হতচকিত অবস্থা কাটেনি। খানিকক্ষণ গাড়ি চলবার পর আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ওনার যাবার জায়গা আমাকে ছেড়ে দেওয়ার রাস্তায় পড়ে না, বাসার কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে গেল নিজস্ব গন্তব্যের দিকে।

কখনও কখনও এমন হয়েছে যে মাছ রান্না করা হয়ে ওঠেনি দিনের পর দিন, দুপুরে ভাতের পাতে মাছ না পেলে বাঙালির প্রাণ আকুলি বিকুলি করত, আমাদের ল্যাবরেটরীর রমেশ যখনি টিফিন ক্যারিয়ার খুলে দেখতো যে ওর বউ মাছের ঝোল দিয়েছে, ও একটা বাটিতে একটু ভাত, আধখানা মাছের টুকরো, এক টুকরো আলু ও ঝোল দিয়ে চুপিসারে আমার টেবিলে রেখে যেত, পরে ওর বউ জানতে পেরে মাছ রান্না করলে আমার জন্যও একটা বাটি আলাদা করে পাঠাতো। শুধু কি মাছ! শাকভাজা,বড়ি ভেজে গুঁড়িয়ে, তাতে পিয়াজ, রসুন, লঙ্কা দিয়ে মেখে বড়িচূর্ণ, আহা যেন অমৃত! কত রমেশেরা এরকমভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কে জানে।

বিরঞ্চি আসত প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূর থেকে, ওর বউ রাত চারটেতে উঠে ওর জন্য আটা মেখে অনেকগুলো রুটি তৈরি করে দিত, যাতে দু-তিনবার যেন খেতে পারে,। আমি ওকে রুটি তরকারি টিফিন আনতে দিলে ও অধিকাংশ সময় খালি তরকারি কিনে এনে ওর রুটি থেকে আমায় রুটি দিয়ে যেত। হাজার মানা করলেও কানে তুলতো না। বলতাম তোর বউ বকবে, কিছু না বলে খালি হাসতো। মাঝে মাঝে আমরা কয়েকজন টিফিনে বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে খেতাম। সেই সব দিনগুলোতে বিরঞ্চি পুরো রুটির গোছা আমার ব্যাগে চালান করে দিত, বলতো আপনি রাতে খাবেন, ও ছিল অফিসের অস্থায়ী কর্মচারী,মাস গেলে সাত- আট হাজার টাকা হয়তো পেতো,তাতে কি !ওর দেওয়া থোয়ায় কোন কমতি ছিল না।

মুরগির ঝোলে খোসা শুদ্ধ গোটা গোটা রসুন ফেলে দিয়ে রান্না হতো পুনমদের বাড়িতে।, ভাতের সাথে রসুন সেদ্ধ মেখে মুরগির টুকরো দিয়ে খেতে খারাপ লাগত না রসুনের খোসা গুলো কখনো কখনো টাকরাতে লেগে গেলে অসুবিধে হতো। এছাড়া মাসিমার হাতে তৈরি চালের গুঁড়ো দিয়ে বকফুলের বড়া বা মুলো,উচ্ছে, বেগুন, আলু, বড়ি দিয়ে করা শুক্তো, কুমড়ো শাকের চচ্চড়ি অথবা রবিবারের দুপুরে মাংসের চর্বির বড়া চেটেপুটে খেতে খেতে, মনেই হতো না যে বাড়ির বাইরে পড়ে আছি। পুনম ছিল ইংরেজি সাহিত্যের পোকা, ও সুবাদে "দ্য গ্লাস প্যালেস", "দ্য ফার্ম", "ডিজিটাল ফরট্রেস" অসংখ্য পুরনো "রিডার্স ডাইজেস্ট" আরো কত যে ভালো ভালো বই পড়ে সমৃদ্ধ হয়েছি, কখনো ভুলতে পারবো না। আমার পরবাসের নিঃসঙ্গতা ওরা সান্নিধ্য ও সৌহার্দ্য দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিল।

ঢেঙ্কানলে আমার একটা প্রজেক্ট চলছিল, ওখানকার কাজের ওপর একটা ভিডিও বানাবার ছিল।, তাই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, কাজের জায়গায় পৌঁছে জল কাদার মধ্যে মাঠে নামলাম। ফটোগ্রাফি শুরু করা হলো, এর মধ্যে আমার দুর্বল চটি গেল ছিড়ে। চটি কাদার ভেতর একেবারে পুঁতে গেছে বার করা যাচ্ছে না ফটোগ্রাফার ওর চটি টা আমায় দিয়ে দিল। সেই চটি পায়ে ভিডিও তোলা শেষ

করে গাড়িতে ফিরে এলাম। এবার ফটোগ্রাফারের চটি ফেরত দিয়ে ড্রাইভারের চপ্পল পরে নিলাম। সেই চপ্পল পরে বাকি কাজ শেষ করলাম।

কাজ করতে করতে একদিন আধা কিলোমিটার ও যাইনি, স্কুটারের স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল, অনেকবার কিক মারলাম, স্কুটারের তেল ফুরিয়ে গেছে, এক ফুচকাওয়ালা আমার অবস্থা দেখছিল।, ও ওর দু চাকা(লুনা) চালিয়ে অফিসে গিয়ে খবর দেয়, অফিসের চৌকিদার বাইকে করে এসে নিজের গাড়ি থেকে রবারের নল লাগিয়ে আমার স্কুটারে বেশ খানিকটা তেল ভরে দিল, সেই তেলে পেট্রোল পাম্প অব্দি গিয়ে তেল ভরলাম। তারপর বাড়ি ফিরলাম। সেই চৌকিদারকে আর তেল ফেরত দেয়া হয়ে ওঠেনি।

অফিসের ছুটির পর একদা সদ্য শেখা চার চাকা নিয়ে এক পরিচিতের বাড়ি গেছি, গল্পগাছা করে খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরছি, ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে নটা, রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। ভুবনেশ্বরের রাস্তা ভীষণ উঁচু-নিচু, উঁচু থাকলে গাড়ি ওপরে ওঠাতে গেলে খালি পিছনে চলে আসে, অথবা স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়, এইসবের জন্যই রাত করে বেরিয়েছি। একটা ঢালু জায়গায় ট্রাফিক চালু হলে গাড়িকে ওপরে ওঠাতে হবে, ট্রাফিক চালু হল, বন্ধ হল আবার চালু হলো। গাড়ি যতবার ওপরে নিতে যাচ্ছি, স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মাঝপথে আমার গাড়ি থেমে আছে। অন্য দিক দিয়ে আসা গাড়ি গুলোর অসুবিধে হচ্ছে। স্টিয়ারিং হাতে আমার তখন "ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি"র মত অবস্থা। ট্রাফিক পুলিশ আমার করুন মুখ দেখে, আমার গাড়ির কাছে এসে যতক্ষণ না আমি গাড়ি তুলতে পারছি, ততক্ষণ আমার দিকে রাস্তা খোলা রাখলেন। অবশেষে গাড়ি উঠলো। পুলিশকে আমায় 'ভি' দেখালেন। আমি মাথা নেড়ে বাড়ির পথে এগিয়ে চললাম।

পুরী থেকে ট্রেনে করে ফিরছিলাম, অন্ধকার হয়ে এসেছে,'পাটিয়া পি এইচ' স্টেশনে নেমেছি। যাত্রীদের অনেকেই দু চাকা,অটো বা গাড়ি করে চলে যাচ্ছে, আমি স্টেশনের বাইরে এসে হেঁটে হেঁটে চলেছি। একটা বাইক এসে পাশে দাঁড়ালো, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল, আলো-আঁধারি রাস্তায় বাইক চালকের মুখটাও ভালো দেখা যাচ্ছিল না। তাতে কি! আমাকে নামিয়ে দেয়ার পর ওনার হাতে একটু পুরীর প্রসাদ দিয়ে ধন্যবাদ জানালাম।

বড়দারা কাশ্মীরে টিউলিপ দেখতে গিয়েছিল, হঠাৎ অক্সিজেন লেভেল কমে যাওয়াতে বড়দাকে অনন্তনাগের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে আমাদের খবর দেওয়া হল। আমি আর দাদার ছেলে রওনা দিলাম কাশ্মীরের দিকে। কোনদিন অনন্তনাগ আসিনি, আর সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে প্রিপেড ফোন চলছে না, অন্তর্জাল ও থেমে আছে। সেই অবস্থার মধ্যে শেষ বিকেলে হাসপাতালে পৌঁছে গেলাম, বড়দা একটু ভালো আছে, তাই আমরা বাড়ি নিয়ে যাব ঠিক করলাম। তখন রমজান মাস চলছে, সূর্য ডুবলে ইফতার শুরু হলে এক্ষুনি সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে, কিভাবে যে একজনের প্রায় বন্ধ হয়ে আসা দোকান খুলিয়ে ফিরে আসার টিকিট কেটেছি ভাবলে অবাক লাগে, অসংখ্য ভালবাসায় ভরা বাড়ানো হাত ধরে কলকাতা পৌঁছে গেছিলাম অবশেষে আমি প্রায় সময় ছাতা নিয়ে বেরোই না। বৃষ্টি এলে ওড়না মাথার উপর জড়িয়ে নিই আর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলে কোন দোকানের সামনে বা শেডের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ি, কতজন যে এই সবসময় আমাকে তাদের ছাতার মধ্যে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে, তার কোন লেখা জোকা নেই।

সবজি বাজারে আলু কিনেছি, একটা ফুলকপি কিনে থলেতে ঢোকাতেই থলে ছিড়ে আলু কপি মাটিতে গড়াগড়ি, আজকাল পলিথিন সব জায়গায় রাখে না। ওই সবজিওয়ালাই একটা খবরের কাগজে সব ভালো করে মুড়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। নিত্যদিনের জীবন পথে এই পাথেয় টুকু সঙ্গে নিয়ে আমাদের পথ চলা।

বাবা,রাঙ্গাপিসিমা,কাকাবাবু এদের মুখে শুনেছি অনেক আগে যখন কলকাতার রাস্তায় বাসের থেকে বেশি ট্রাম চলত টিং টিং ঘন্টা বাজিয়ে,বাসনওলারা ঝাঁকা মাথায় ঢং ঢং করে কাঁসর বাজাতে বাজাতে কাঁসা-পিতলের বাসন ফেরি করতো,তখন উত্তর কলকাতার অলিতে গলিতে মুসলমান ফকিরেরা একটা সাদা চামর দোলাতে দোলাতে হেঁকে যেতেন ---- '...মু শ কি ল আ সা ন...', কোন বাড়ি থেকে ডাকলে সেই বাড়ির ছোট ছেলেপিলেদের অল্প পয়সার বিনিময়ে সারা গায়ে চামর বুলিয়ে, গায়ে মাথায় ফুঁ দিয়ে, বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ঝেড়ে দিতেন, গুরুজনেরা বিশ্বাস করতেন যে এতে

বাচ্চাদের কুনজর লাগবে না, ওদের কোন ক্ষতি হবে না, আর সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। দিনকাল পাল্টে গেছে। লোকেদের বিশ্বাস বদলেছে, তাই এখন আর ওদের দেখতে পাওয়া যায় না।

সাহায্য চাইলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু তার সাথে মিশে থাকে আবেদনের কুণ্ঠা, আর না চাইতে বাড়ানো সাহায্যের হাত হয় অকুন্ঠ, আশ্বাসে ভরা, মুশকিল আসানের চামরের কোমল স্পর্শ। বেতাল, ট্যালা, তারছেঁড়া মানুষদের জন্য এই মুশকিল আসানেরা এখনও আছে সব জায়গায় ছড়িয়ে, ছিটিয়ে, অসুবিধেতে পড়লে কোন অজানা অচেনা জায়গা থেকে এরা পাশে এসে দাঁড়ায়, আশ্বাস যোগায়, আর সব মুশকিল আসান করে দিয়ে নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়।

তাইতো আজও ঘুঘু ডাকা স্তব্ধ দুপুরে, কাঠফাটা রোদ্দুরে এখনো কান পাতলে শোনা যায় কোন সুদূর প্রান্তরে ফকিরেরা হেঁকে চলেছে ------- **'.....মু শ কি ল আ সা ন....'**।

টুকরো হাসি

কৃষ্ণেন্দু দাস

চোরের বুদ্ধি:

এক চোর রাতে চুরি করতে গিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকল। ঘরে ঢুকে দেখে, সেখানে একটা পোষা তোতাপাখি রয়েছে। চোর জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করতেই তোতাপাখি বলে উঠল, "এই, রামবাবু দেখছে!" চোর ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। আবার যেই জিনিসপত্র গোছাতে যাবে, তোতাপাখি আবার বলে উঠল, "এই, রামবাবু দেখছে!" চোর এবার রেগে গিয়ে তোতাপাখিকে ধরে বলল, "রামবাবু কে?" তোতাপাখি বলল, "রামবাবু আমার পোষা কুকুরের নাম !

পরীক্ষা:

শিক্ষক: "বলতো, জল কাকে বলে?"

ছাত্র: "জল হল সেই জিনিস, যা দেখলে তেষ্টা পায়।"

শিক্ষক: "বাহ, খুব ভালো বলেছ। এবার বলতো, জল কত প্রকার?"

ছাত্র: "জল দুই প্রকার। ঠান্ডা জল আর গরম জল।"

ডাক্তার:

রোগীঃ ডাক্তারবাবু, আমার খুব মাথা ব্যাথা করছে।

ডাক্তারঃ আপনার কি মাথা আছে?

রোগীঃ হ্যাঁ।

ডাক্তারঃ তাহলে তো ব্যাথা করবেই।

বিচার:

বিচারক: তুমি কি সত্যিই এই বৃদ্ধার ব্যাগটা চুরি করেছ?

চোর: না হুজুর, আমি শুধু দেখছিলাম ওনার ব্যাগে ওনার মোবাইল ফোনটা আছে কি না।

বিচারক: তাহলে বৃদ্ধা চিৎকার করছেন কেন?

চোর: আসলে ওনার মোবাইল ফোনের রিংটোনটা আমার মোবাইলের রিংটোনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

ভিখারি:

ভিখারি: বাবু কিছু পয়সা দিন, কাল থেকে কিছু খাইনি।

লোকটি: তাহলে আজ খেয়ে নিন।

ভিখারি: তাহলে কি কাল আবার না খেয়ে থাকতে হবে?